KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication : ৫৪ সূর্যকুমার নন্দিনী, কল-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher : আবাবীল প্রকাশন
Title : চতুরঙ্গ	Size : 7"x 9.5" 17.78 x 24.13 c.m.
Vol. & Number : ২০/১ ২০/২ ২০/৩ ২০/৪	Year of Publication : বৈশাখ - আষাঢ় ১৩৬৮ শ্রাবণ - আশ্বিন ১৩৬৮ কার্তিক - পৌষ ১৩৬৮ মাঘ - চৈত্র ১৩৬৮
	Condition : Brittle Good
Editor : হুমায়ুন কবির	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

চতুরঙ্গ হুমায়ুন কবির সম্পাদিত ত্রৈমাসিক পত্রিকা

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

চতুরঙ্গ

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮

ত্রৈমাসিক পত্রিকা **চতুরঙ্গ** শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৮

॥ সূচীপত্র ॥

হুমায়ুন কবির ॥ সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ ৯৩
প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥ কিন্নর ১০১
বিষ্ণু দে ॥ চেনা পাথর ১০২
হরপ্রসাদ মিত্র ॥ যেতে যেতে ১০৪
জ্যোতির্ময় রায় ॥ মন ও মুহূর্ত ১০৫
প্রণবকুমার বর্ধন ॥ গত দশকে ভারতবর্ষের আর্থিক বৃদ্ধি ও বণ্টন ১১৪
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ॥ শ্বাপদ ১১৮
জন ওভিটন ॥ সুরাটে ইংরাজ কুঠি ১৪৫
হরপ্রসাদ মিত্র ॥ আধুনিক সাহিত্য ১৫৩
সমালোচনা—পৃথ্বীশ চক্রবর্তী, চিদানন্দ দাশগুপ্ত, নৃপেন্দ্র সান্যাল, মণীন্দ্র রায়, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ১৫৯

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

১৮৬৭
খৃষ্টাব্দ
হইতে
ভারতের সেবায়
নিয়োজিত

বামার লরী

কলিকাতা • বোম্বাই • নিউ দিল্লী • আসানসোল

সোভিয়েট দেশে তিন সপ্তাহ

হুমায়ুন কবির

সোভিয়েট জীবনের বিভিন্ন দিকের খানিকটা আলোচনা পূর্বে করেছি, কিন্তু তার বিচিত্র প্রকাশের পূর্ণ বিবরণ দেওয়ার জন্য যে সময় ও অধ্যয়নের প্রয়োজন, তার সুযোগ পাইনি। প্রথম বার মস্কোতে প্রায় পাঁচ সপ্তাহ ছিলাম, কিন্তু তার চার সপ্তাহ কেটেছিল হাসপাতালে। দ্বিতীয় বার তিন সপ্তাহে অনেকখানি ঘুরেছিলাম, কিন্তু তিন সপ্তাহে এত বিপুল দেশের বিচিত্র নরনারীর সম্যক পরিচয় কি করে মিলবে? তবু মস্কো লেনিনগ্রাডের আবহাওয়ার পার্থক্য, কিয়েভে উক্রেনবাসীর দিলখোলা আলোচনা এবং তাসকন্দে মধ্য এসিয়ার চিরপ্রসিদ্ধ আতিথেয়তা সন্তরমান পথিকের দৃষ্টিতেও ধরা পড়ে। তৃতীয় বার মোটে চারদিন ছিলাম। সমস্ত সময় মস্কোতেই কেটেছে। কিন্তু তার মধ্যেই মস্কোর বাহ্যিক রূপান্তর ও মানসিক পরিবর্তন আরো স্পষ্ট ভাবে দেখেছি।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে পরিবর্তন সুরু হয়, প্রথমবার তার বিশেষ কোন বাহ্যিক প্রকাশ দেখিনি। কিন্তু ১৯৫৯ সালে যখন দ্বিতীয় বার গেলাম, তখন দেশের আবহাওয়া বদলে গেছে। দোকান বাজারে নানাধরণের জিনিষপত্র বাড়তে সুরু করেছে, পথে লোক-চলাচল আগের তুলনায় বেশী। পথচারী স্ত্রী পুরুষের পোষাকে কথায় ব্যবহারে পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী বৈচিত্র্য এবং স্বাধীনতা সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। বিপ্লবের প্রথম যুগে সোভিয়েট নাগরিক জীবনকে উপভোগ করবার কথা ভাবেনি, হয়তো ভাবতে পারেনি। ১৯৫৬ সালে সেই পূর্বের কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনার ছবিই দেখেছি কিন্তু ১৯৫৯ সালে তিন বৎসরের মধ্যে দেশের বাইরের চেহারা ও জনসাধারণের মনোভাবে অনেক পরিবর্তন এসেছে মনে হ'ল। ১৯৫৯ সালে যে হাওয়া বইতে সুরু করেছিল, এবারে ১৯৬১ সালে যখন মস্কো গিয়েছিলাম তখন তার প্রভাব আরো গভীর এবং সুদূরপ্রসারী দেখলাম। পূর্বে সোভিয়েট রাষ্ট্র বা মার্কসবাদের কোন সমালোচনা করলে আলোচনা স্তব্ধ হয়ে যেতো দেখেছি, এবার দেখলাম যে বহু নাগরিক নিজেদের মধ্যে রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং জীবনদর্শনের আলোচনা করছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিষয় কিছু বলতে বা লিখতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা উচিত যে রক্তাক্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়েই সোভিয়েট রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা বদলিয়েছে, মানুষের জীবন

দৃষ্টি ও প্রকাশভঙ্গি বদলিয়েছে। সেই রক্তাক্ত বিপ্লবের যুগে লক্ষ লক্ষ নরনারী নিদারুণ দুঃখ ভোগ করেছে, প্রাণ দিয়েছে ও নিয়েছে। অন্তর্যুদ্ধ ও গৃহবিবাদের ফলে জাতির ও সমাজের জীবন বিধ্বস্ত হয়েছে, পারিবারিক সম্বন্ধ শিথিল হয়ে গিয়েছে, ঘরবাড়ী ক্ষেত কারখানা সম্পত্তি ধ্বংস ও জাতির অর্থসম্পদ বিনষ্ট হয়েছে। গৃহশত্রু ও বহিশত্রুর আক্রমণ ব্যর্থ করে শিশুরাষ্ট্রকে বাঁচিয়ে রাখাই ছিল সেদিন রাষ্ট্রনেতাদের একমাত্র লক্ষ্য। তাই জাতির সমস্ত উদ্যম ও শক্তি আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। যুদ্ধ-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে সোভিয়েট রাষ্ট্রের বিস্ময়কর প্রগতির মূলে আত্মরক্ষার এই তীব্র প্রেরণা।

আত্মরক্ষার তাগিদে কিন্তু জীবনের অন্যান্য অনেক দিকে ক্ষতি হয়েছে। আভ্যন্তরীণ শত্রুর হাত থেকে বাঁচবার জন্য যে পুলিশী-ব্যবস্থা, তাতে ব্যক্তির ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য আঘাত পেয়েছে, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ বহুভাবে ব্যাহত হয়েছে। বহিশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করবার জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় বহু সেবা ও স্বাচ্ছন্দ্য বর্জন করতে হয়েছে, রাষ্ট্রের জীবনে সামরিক শৃঙ্খলার বন্ধন কঠিন হয়ে দেখা দিয়েছে। হিংসা দ্বন্দ্বের পথে সামাজিক পরিবর্তনকে আহ্বান করার ফলে দেশের ভিতরে এবং বাইরে এমন হিংস্র ও আক্রমণাত্মক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল যে প্রায় চল্লিশ বৎসর শত্রুমিত্রনির্বিশেষে সবাইকেই তার জন্য নিদারুণ দুঃখভোগ করতে হয়েছে। লেনিনের মৃত্যুর অব্যবহিত পর থেকে স্টালিনের মৃত্যু পর্যন্ত এই যে চল্লিশ বৎসর সোভিয়েট জনসাধারণ অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে এসেছে, পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কম জাতিই সে রকম পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে তাতে জয়লাভ করেছে।

সোভিয়েট রাষ্ট্রে জনসাধারণের খোরাক-পোষাকের আজো পুরোপুরি ব্যবস্থা হয়নি। শুধু যে সমস্ত জিনিষ দুর্মূল্য তা নয়, যে সব জিনিষ পাওয়া যায়, স্বাস্থ্যের বিচারে গ্রহণ-যোগ্য হলেও রুচির বিচারে তাদের স্থান অতি সাধারণ। পাঁচ বছর আগে দেখেছি যে রুশ নাগরিকের ঘরবাড়ী পোষাক অতিশয় মামুলী, জনসাধারণের অনেকের ভাগ্যেই যে খোরাক জোটে, তাতে বৈচিত্র্যের একান্ত অভাব। খাস মস্কোর বড় বড় হোটেলে রুষ খাদ্যদ্রব্যের বিশেষ কদর নাই। তুর্কী বা উক্রেনী বা তাজিক খাদ্যদ্রব্যেরই সমাদর বেশী। ইয়োরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই নিজস্ব রন্ধনপ্রণালীর পরিচয় মেলে। সোভিয়েট রাষ্ট্রের রুষ অঞ্চলে তা নেই কেন বোঝাতে গিয়ে একজন সম্মানিত রুষ নাগরিক বললেন যে ১৯৩০-৩৭ সাল তাঁদের যে কি দুর্দশায় কেটেছে, ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্য কেউ তার কল্পনাও করতে পারবে না। তিনি বললেন যে তাঁর নিজের বাড়ীতে অনেক সময়ে ঘাস পাতা সেদ্ধ করে ছেলেমেয়েদের ক্ষুধা নিবারণ করেছেন। প্রথম যুগের পঞ্চশালা পরিকল্পনার জন্য মূলধন যোগাতে রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ ব্যয় হয়েছে। জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দৃষ্টি দেবার সুযোগ মেলেনি। ১৯৩৭ সালের পরে যখন অবস্থার একটু উন্নতির সম্ভাবনা দেখা দিল, তখন ঘনিয়ে এল মহাযুদ্ধের কালো ছায়া। হিটলারের আক্রমণে রুষে যে ধ্বংসলীলা, পৃথিবীর ইতিহাসে তার নজীর মিলবে না। পূর্বের দশ বৎসর মানবজীবনের অন্য সমস্ত দাবী ভুলে গিয়ে কেবল আত্মরক্ষার সাধনা একাগ্রভাবে না করলে বোধ হয় সোভিয়েট রাষ্ট্র নাজী জার্মানীর প্রচণ্ড আক্রমণ রোধ করতে পারত না।

বিপ্লবের পথে সামাজিক পরিবর্তন আনতে চেয়েছিল বলেই সোভিয়েট নাগরিককে এত দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছে। বিপ্লবের ভয়ে অন্য দেশ সোভিয়েট রাষ্ট্রকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে নি। শুধু তাই নয় বিশ্ব-বিপ্লবের আহ্বানে অন্যান্য রাষ্ট্র আতঙ্কিত হয়ে সোভিয়েট রাষ্ট্রকে শত্রু মনে করেছে। ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্র বহিরাক্রমণ

থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য অস্ত্রসজ্জা করতে বাধ্য হয়েছে। শ্রেণীসংগ্রামের দরুন দেশের অভ্যন্তরেও বিবাদ ও সংঘাত দেখা দিয়াছে। ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রথম ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর কেবল আত্মরক্ষারই সাধনা করেছে, দেশ গঠনের দিকে তেমন মনোযোগ দিতে পারে নি।

ভারতবর্ষেও কখনো কখনো বিপ্লব ও সংস্কারের তুলনামূলক আলোচনা শোনা যায়। বিপ্লববিলাসী কেউ কেউ বলে থাকেন যে সংস্কারের পথ বর্জনীয়, রক্ত-বিপ্লবের মধ্য দিয়াই দেশ সিদ্ধিলাভ করতে পারে। তাঁরা ভুলে যান যে সংস্কারের পথে চলেছে বলেই ইংরেজ সংখ্যায় অল্প হয়েও পৃথিবীতে বহুকাল আধিপত্য করেছে। বিপ্লবের পথে অন্তর্দ্বন্দ্ব ও আভ্যন্তরীণ সম্পদ হানি তো রয়েছেই, কিন্তু তার চেয়ে বেশী ক্ষতি হয় যে তার ফলে অন্তশত্রু ও বহিশত্রুর আক্রমণ রোধ করতেই জাতির উদ্যম ও শক্তির বহুল অপব্যয় হয়। ব্যক্তির জীবনে সংঘাতের চেয়ে সহযোগের পথ বাঞ্ছনীয়—জাতির জীবনেও তার ব্যতিক্রম হয় না। বিপ্লবের পথে চললে প্রতিবিপ্লবের আশঙ্কা তো রয়েছেই, তা ছাড়াও সংঘাত সংঘর্ষে সৃষ্টিকারী শক্তির অপব্যয় অনিবার্য। অন্য সমস্ত বিচার ছেড়ে দিলেও সংঘর্ষের পথে বহুজনের জীবনে যে দুঃখ বেদনা গ্লানি, তাও সমাজের পক্ষে কম লোকসান নয়। বিপ্লব ও সংস্কারের তুলনা *Science, Democracy and Islam* গ্রন্থে আমি বিস্তারিত ভাবেই করেছি এখানে তার পুনরুক্তি করতে চাই না। শুধু এই কথা বললেই চলবে যে পূর্বকালে যদিও বা বিপ্লবের স্বপক্ষে কথা বলা চলত, বর্তমান যুগের পৃথিবীতে সে সব কথা একেবারে অচল। বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে মানুষ যে সমস্ত ভয়াবহ অস্ত্র আবিষ্কার করেছে, সেই অস্ত্র-কণ্টকিত পৃথিবীতে বিপ্লবের পথে চললে মানবজাতির মৃত্যু অনিবার্য। রুষ রাষ্ট্রনেতা ক্রুশ্চভ সে কথা উপলব্ধি করেছেন বলেই আজ তিনি স্টালিনের পথ বর্জন করে লেনিনেরা মতবাদেরও সংশোধন দাবী করেছেন।

অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বহির্দ্বন্দ্বের সমস্ত সংঘাত জয় করে সোভিয়েট রাষ্ট্র জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে বিস্ময়কর প্রগতি দেখিয়েছে, ব্যাপকভাবে জনশিক্ষার ফলেই তা সম্ভব হয়েছে। ইসলামের অভ্যুদয়ের প্রথম যুগে হজরৎ মহম্মদ সার্বজনীন শিক্ষার প্রতি যে জোর দিয়েছিলেন, তার তুলনা পৃথিবীর ইতিহাসে মেলে না। রুষ বিপ্লবের পরে রুষ রাষ্ট্রনেতারাও ঠিক সেই ভাবেই সার্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন করতে চেষ্টা করেছেন, এবং তাঁদের সে চেষ্টা বহুলাংশে সফল হয়েছে বলেই আজ সোভিয়েট রাষ্ট্র বিজ্ঞানে শিল্পে শিক্ষায় পৃথিবীতে অগ্রণী। শিক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্র জাতি ধর্ম বর্ণের প্রভেদ করেনি, উন্নত অনুন্নতের মধ্যে পার্থক্য রাখে নি। সমগ্র রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের জন্য নিজের ভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা করে সকলের সামনেই উন্নতির পথ খুলে দিয়েছে। প্রায় সমস্ত সমাজেই শতকরা চার-পাঁচ জন শিশু মেধাবী, কিন্তু বহু সমাজে দারিদ্র্য বা অন্য সামাজিক কারণে তাদের মধ্যে বড় জোর দুয়েকজন শিক্ষা ও উৎকর্ষের সুযোগ পায়। সোভিয়েট-পূর্ব রুষ দেশে সমাজের শতকরা একজনেরও এ সুযোগ মিলত কিনা সন্দেহ। আজ সকলের জন্যই শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে বলে এই নিদারুণ সামাজিক অপচয় বন্ধ হয়ে গিয়েছে, ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে পূর্বের তুলনায় বৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক শিল্পীর সংখ্যা বহুগুণ বেড়ে গিয়েছে।

এ প্রসঙ্গে আর একটি কথাও স্মরণ রাখা প্রয়োজন। সোভিয়েট বিপ্লবের পরে প্রায় দুই দশক ধরে অন্তর্দ্বন্দ্ব থামেনি, কিন্তু হিটলারের আক্রমণের ফলে দেশরক্ষার আহ্বানে সোভিয়েট নাগরিক যে ভাবে সাড়া দিয়েছিল, তাতে অন্তর্দ্বন্দ্ব বহুল পরিমাণে দূর হয়ে যায়। সঙ্গে

সঙ্গে নবজাতকের সংখ্যা বেড়ে চলল, বয়স্কদের মনে প্রাক-বিপ্লবদিনের স্মৃতি মলিন হয়ে আসতে লাগল। কিশোর যারা যৌবনে পা দিল, তাদের সমগ্র জীবন বিপ্লব-পরবর্তী সোভিয়েট রাষ্ট্রে কেটেছে বলে তাদের মনে অন্তর্দ্বন্দ্ব বা সন্দেহের সম্ভাবনা রইল না। আরেক ভাবেও সোভিয়েট নাগরিকের জীবন সহজ হয়ে আসল। লেনিন-ট্রট্স্কী-স্টালিন যুগের যারা মানুষ, সেদিনকার দ্বন্দ্ব-সংঘাত তাদের মনকে যে ভাবে দোলা দিয়েছে, বর্তমান যুগের সোভিয়েট নাগরিককে তা দেয় না, দিতে পারে না। মস্কোতে একজন বিচক্ষণ সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতার সঙ্গে আলোচনায় এই কথাই স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল যে মিস্টার ক্রুশ্চভ যে ভাবে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীদের রাজনীতিক্ষেত্রে পরাজিত করেই তুষ্ট হয়েছেন, তাঁদের দৈহিক মানসিক বা আর্থিক কোন ক্ষতির চেষ্টাও করেননি, স্টালিনের পক্ষে তা কল্পনা করাও অসম্ভব ছিল। ক্রুশ্চভ-পরবর্তী যুগে যাঁরা সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতার স্থান অধিকার করবেন, তাঁদের পক্ষে স্টালিনের কার্যকলাপ সমর্থন তো দূরের কথা, বোঝা-ই হয়তো কঠিন হবে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতারা যে দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন, তার আর একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করতে চাই। বর্তমান যুগ যে বিশেষ ভাবে বিজ্ঞানের যুগ, সে কথা সোভিয়েট শিক্ষা পদ্ধতি যে ভাবে স্বীকার করেছে, অন্যদেশে বোধ হয় তা হয়নি। পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে নয় বৎসর বয়সেই সোভিয়েট ছাত্র বিজ্ঞান শিখতে সুরু করে, চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছয় বৎসর বিজ্ঞান প্রত্যেকেই পড়ে। চৌদ্দর পরে যারা মাধ্যমিক শিক্ষালয় করে, তারা আরো তিন বৎসর বাধ্যতামূলক ভাবে বিজ্ঞান চর্চা করে। ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রের সমস্ত নাগরিকের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বিজ্ঞানে পারদর্শী, এবং বিজ্ঞানের এই ব্যাপক প্রসারের ফলেই রসায়ণ পদার্থবিদ্যা জীববিদ্যায় সোভিয়েট রাষ্ট্র বিস্ময়কর প্রগতি দেখিয়েছে।

বিজ্ঞানকে শিক্ষার অন্যতম প্রধান অঙ্গ করায় কেবল যে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সূত্রের জ্ঞান বেড়েছে, তা নয় সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীও ব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। বর্তমানে সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্যকলা নিয়ে আলোচনা সুরু হয়েছে, দশ বৎসর পূর্বে স্টালিনের আমলে তা কল্পনার অতীত ছিল। স্টালিনের মৃত্যুতে এক যুগের অবসান এবং অন্য যুগের সুরু, কিন্তু বিগত ত্রিশ-চল্লিশ বৎসরে সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যাপক ভাবে ছড়িয়ে না পড়লে বর্তমানের এ বিকাশ সম্ভব হ'ত না। এখনো নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন পুরোপুরি দানা বাঁধেনি, কিন্তু যে ভাবে নানা প্রশ্ন উদ্বেলিত হয়ে উঠছে, তাতে দশ বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্রে নতুন রেনেসাঁস দেখা দেবে আশা করা যায়। সোভিয়েটের একজন রাষ্ট্রনেতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম যে জিজ্ঞাসা ও প্রশ্ন বিজ্ঞানের ভিত্তি, সমস্ত দেশে ব্যাপক বিজ্ঞান শিক্ষার ফলে তাই একদিন সোভিয়েট রাষ্ট্রের পূর্বসিদ্ধান্ত মার্কসবাদ নিয়েই জনসাধারণের মধ্যে সন্দেহ জাগা অসম্ভব নয়। উত্তরে তিনি বললেন যে ভবিষ্যতের সোভিয়েট নাগরিককে বর্তমান যুগের উপযোগী করে তোলাই শিক্ষার লক্ষ্য, তার ফলে যদি একদিন মার্কসবাদের কোন সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার প্রয়োজন হয়, তাহলে তার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে।

মিস্টার ক্রুশ্চভের নেতৃত্ব সোভিয়েট নাগরিক যে এত আগ্রহের সঙ্গে স্বীকার করেছে তার কারণ যে তিনি আশাবাদী। সোভিয়েট রাষ্ট্র নেতাদের মধ্যে তিনিই প্রথম সবলকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন যে দ্বন্দ্বসংঘর্ষ ভিন্নও সমাজব্যবস্থার রূপ বদলাতে পারবে। যুদ্ধক্ষেত্রে সংঘাতের বদলে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রকে তিনি জনসাধারণের জন্য সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান করেছেন। সামরিক শক্তির দ্বারা নয়, প্রতিদিনের

ব্যবহার্য জিনিষের প্রাচুর্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র একদিন ধনতন্ত্রবাদী দেশগুলিকে পরাজিত করবে, সমগ্র সোভিয়েট রাষ্ট্রের সামনে এই আদর্শ স্থাপন করে মিস্টার ক্রুশ্চভ দুইভাবে দেশবাসীর চিত্ত জয় করেছেন। সোভিয়েট নাগরিক যুদ্ধের দুঃখবেদনা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে, তাই যুদ্ধের নামে তার মনে আতঙ্ক আসে। যুদ্ধের সম্ভাবনাকে যতদিন সোভিয়েট রাষ্ট্র-দর্শনের অপরিহার্য অঙ্গ মনে করা হয়েছে, ততদিন সোভিয়েট নাগরিক জীবনের নানাক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষণ দেখেও আশ্বস্ত হতে পারেনি। তার মনে সর্বদাই আশঙ্কা ছিল যে বিজ্ঞানে শিল্পে উদ্যোগে এত উৎকর্ষ সত্ত্বেও দেশ আনবিক যুদ্ধের আঘাতে মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যাবে। একদিকে শস্ত্র-শক্তি বাড়িয়ে এবং অন্য পক্ষে যুদ্ধ বর্জনের সম্ভাবনার উপর জোর দিয়ে মিস্টার ক্রুশ্চভ সোভিয়েট নাগরিকের নিত্যসঙ্গী আসন্ন মৃত্যুর আকঙ্ক দূর করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-আমোদপ্রমোদে কুড়ি বৎসরের মধ্যে সোভিয়েট রাষ্ট্র আমেরিকাকেও ছাড়িয়ে যাবে এই আশার ছবি সোভিয়েট নাগরিকের সামনে উপস্থিত করে তার প্রাণে নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছেন।

সমরবিজ্ঞান ও অস্ত্রশস্ত্র উৎপাদনে সোভিয়েট রাষ্ট্র স্টালিনের আমলেই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তিগুলির সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। সোভিয়েট রাষ্ট্রীয় জীবনে বোধ হয় এই ক্ষেত্রেই স্টালিনের দান স্মরণীয় হয়ে থাকবে। সমর সম্ভারের উৎকর্ষ সাধনের জন্য স্টালিন কিন্তু যে দাম দিয়েছিলেন, সোভিয়েট নাগরিক কোনদিনই তা সর্বান্তঃকরণে স্বীকার করে নি। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৭ পর্যন্ত আভ্যন্তরীণ মতভেদ ও সংঘর্ষে তা বারবার প্রকাশ পেয়েছে, কিন্তু স্টালিন কঠোর ভাবে সমস্ত অসন্তোষ ও বিক্ষোভ দমন করেছেন, যুক্তিযুক্ত সমালোচনাকেও স্বীকার করেন নি। ফলে সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতাদের পুরোপুরি একটা গোষ্ঠী হয় বিদ্রোহ অথবা আত্মঅবলুপ্তির মধ্যে নষ্ট হতে বসেছিল, কিন্তু হিটলারের অবিমৃষ্যকারিতার ফলে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব শেষ হয়ে জাতির সমস্ত উদ্যম ও উৎসাহ বহিঃশত্রুকে পরাজিত করতে উন্মুখ হয়ে উঠল বলে সোভিয়েট রাষ্ট্রে নূতন নেতৃত্বের সম্ভাবনা দেখা দিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রথম কয়েকমাসেই পুরাতন নেতৃত্বের দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ল, তখন রাষ্ট্র-রক্ষার জন্য যে নতুন নেতৃবৃন্দ এগিয়ে এলেন, স্টালিনের মৃত্যুর পরে রাষ্ট্রশক্তি তাঁদের হাতে স্বভাবতঃই এসে পড়ল।

যুদ্ধের সময়ে স্টালিনের আমলেই রাষ্ট্রের দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিবর্তন সুরু হয়, তার ফলে স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রীতির এক নতুন মূল্যায়ন হ'ল। রুষ বিপ্লবের প্রাথমিক যুগে প্রাক-বিপ্লব যুগের প্রায় সব কিছুই অস্বীকার করবার প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, কিন্তু যুদ্ধের প্রয়োজনে পুরাতনের পুনপ্রতিষ্ঠা সুরু হ'ল। যে পিটরের নাম এককালে বিপ্লবী রুষ শুনতেও চায়নি, পেট্রোগ্রাডের নাম বদলে লেনিনগ্রাড হয়েছে, পরবর্তী কালে সেই পিটরকেই জাতির শ্রেষ্ঠতম নেতাদের সামিল করা হ'ল। শুধু রাজনীতি বা ইতিহাস বলে নয়, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও স্বজাতিপ্রীতির দাবীতে বহু বিস্মৃতপ্রায় মনীষী অথবা অপ্রচলিত জ্ঞানের পুনরুজ্জীবনের সজ্ঞান প্রচেষ্টা সুরু হ'ল। আজকাল বিজ্ঞানের প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কৃতিত্ব রুষ পূর্বসূরীর সাধনার ফল বলে দাবী করা হয়। তাতে একপক্ষে বর্তমান যুগের সোভিয়েট নাগরিকের জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় গর্ব বাড়ে, অন্যপক্ষে সোভিয়েটপূর্ব রুষ জীবনের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ধান ও গবেষণার প্রেরণা যোগায়।

চিকিৎসাশাস্ত্রের একটা উদাহরণ দিলেই একথা স্পষ্ট ভাবে বোঝা যায়। রুষ চিকিৎসা-বিজ্ঞান একদিকে নিত্যনূতন আবিষ্কারে পৃথিবীর জ্ঞানভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছে, বহু দুরারোগ্য

ব্যাধির আঁধি খুঁজে পেয়েছে, অন্যদিকে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত লোকচিকিৎসাকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ করে তার উৎকর্ষ সাধনের চেষ্টা করছে। বিভিন্ন ধরনের ঝরনার জলের বিভিন্ন গুণ, বিভিন্ন রোগে তারা উপকারী—এ বিশ্বাস পৃথিবীর প্রায় সবদেশেই জনসাধারণের মধ্যে দেখা যায়। বিশেষ ধরনের তৈলমর্দন বা স্নানের ফলে বিভিন্ন রোগ নিরাময় হয়, এ চিকিৎসা প্রণালী ভারতবর্ষের কেরালা অঞ্চলে আজো প্রচলিত, কিন্তু বর্তমান যুগের বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসা প্রণালীর সঙ্গে তাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা ভারতবর্ষে একেবারেই হয়নি, ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশেও তেমন বিধিবদ্ধভাবে হয়নি। সোভিয়েট রাষ্ট্রের আধুনিকতম চিকিৎসায়ও কিন্তু প্রচলিত লোকচিকিৎসাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। মস্কোর যে হাসপাতালে আমি ১৯৫৬ সালে ছিলাম, সেখানে যেমন একদিকে নূতনতম ঔষধের ইনজেকশন দেওয়া হ'ত, তেমনি অন্যদিকে লোকচিকিৎসার পরীক্ষিত মসলা দিয়ে স্নানের ব্যবস্থাও করা হ'ত। কৃষ্ণসাগর তীরে সোচী অঞ্চলের বিখ্যাত স্নান ও জলপানের চিকিৎসা আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রের বাইরেও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

সার্বজনীন শিক্ষাকে কেন্দ্র করে বর্তমান যুগের সোভিয়েট সমাজ গড়ে উঠেছে বলে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ বিজ্ঞানের প্রয়োগ দিন দিন ব্যাপক হয়ে উঠছে। সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যে কৃষির ক্ষেত্রেই সোভিয়েট রাষ্ট্রের সাফল্য তুলনায় কম। আজ পর্যন্ত সোভিয়েট নাগরিক পর্যাপ্ত পরিমাণে দুধ ডিম মাংস মাখন বা ফল পায় না। আজো মস্কোর বাজারে সময় সময় ফল বা মাছমাংসের কঠোর অনটন দেখা দেয়। মিষ্টার ক্রুশ্চভ তাই আজ দু'তিন বৎসর ধরে কৃষির প্রতি জোর দিয়েছেন বেশী, বিজ্ঞানের নতুন নতুন প্রয়োগে সোভিয়েট জীবনের এই অসাফল্য দূর করতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। ফলে নতুন ধরনের শস্য নিয়ে পরীক্ষা হচ্ছে, বরফে চাপা পড়লেও তা মরবে না, অনাবৃষ্টি সহ্য করেই তা মানুষের খোরাক জোগাবে। সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা হচ্ছে যে আগে যে সমস্ত অঞ্চলে কোনদিন চাষ হয়নি, লোকে ভেবেছে সে সমস্ত জমিতে ফসল ফলানো অসম্ভব, সে সব অঞ্চলেও নূতন পুরাতন নানা ধরনের শস্য উৎপাদনের চেষ্টা দিনদিন বাড়ছে। বিজ্ঞানের শক্তি প্রয়োগে কয়েক বৎসরের মধ্যেই যে সোভিয়েট রাষ্ট্র খাদ্যসমস্যার সমাধান করতে পারবে, আজ সে বিষয়ে বোধ হয় সন্দেহের অবকাশ নেই।

শিল্প ও উদ্যোগের ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রে বিজ্ঞানের প্রয়োগ আরো বেশী ব্যাপক। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি জার্মানীতে বিজ্ঞানের প্রয়োগে শিল্প-উদ্যোগের যে অভূতপূর্ব বিকাশ দেখা দিয়েছিল, বর্তমান শতকের মাঝামাঝি সোভিয়েট রাষ্ট্রে তার পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। স্টালিন যুগের সমরকেন্দ্রিক মনোভাব বর্তমানে অনেকখানি কেটেছে, কিন্তু এখনো সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নি বলে আজো যুদ্ধসম্পর্কিত ক্ষেত্রেই সোভিয়েট শিল্প-উদ্যোগের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ। কিন্তু মানুষের নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রীর যোগানে কুড়ি বৎসরের মধ্যেই আমেরিকার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হতে হবে বলে মিষ্টার ক্রুশ্চভ যে ঘোষণা করেছেন, তার ফলে সমস্ত রকমের শিল্প-উদ্যোগের ক্ষেত্রে এক নবজাগরণের সাড়া পড়ে গিয়েছে। খাদ্যদ্রব্য ছাড়াও পোষাক ও ঘরবাড়ীর অভাব সোভিয়েট রাষ্ট্রে ছিল, কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসর যে ভাবে ঘরবাড়ী তৈরী হচ্ছে, স্বদেশের উৎপাদন বাড়িয়ে ও বিদেশ হতে আমদানী করে সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিষের দাবী মেটাবার চেষ্টা দেখা যায়, তাতে আর পাঁচ-দশ বৎসরের মধ্যেই সোভিয়েট নাগরিকের দুঃখ কৃচ্ছ্রতার দিন অবসান হবে এ ভরসা তাদের প্রায় সকলের মনেই এসেছে।

কোন জাতির জীবনে যখন জোয়ার আসে, তখন সর্বদিকেই শ্রীবৃদ্ধি ও উৎকর্ষের পরিচয় মেলে। বৌদ্ধ যুগে ভারতবর্ষ কেবল আধ্যাত্মিক সাধনার ক্ষেত্র বলে নয়, রাজসিক শক্তি ও বাণিজ্যিক ঐশ্বর্যের ক্ষেত্রেও পৃথিবীতে বরণীয় হয়ে উঠেছিল। গ্রীক সভ্যতার গৌরবের দিনে গ্রীক প্রতিভা সবদিকেই উৎসারিত হয়েছে, ইসলামের প্রথম যুগে আরব দেশ, এলিজাবেথের যুগে ইংলণ্ড অথবা গ্যেটে শিলারের যুগে জার্মানী সাধনার সকল ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মনে হয় যে সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতাদের প্রথম যুগের বহু ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও ব্যাপক শিক্ষার দ্বারা তাঁরা জাতির প্রত্যেক স্তরে সমস্ত মানুষের মধ্যে যে নতুন প্রাণ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন, চল্লিশ বৎসর পরে নতুন শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ জাতি আজ তা মর্মে মর্মে অনুভব করছে। বিজ্ঞানের সাধনায় সোভিয়েট রাষ্ট্র আজ বহিঃশত্রুর আক্রমণ-ভয়কে জয় করেছে, আজ বরং আশঙ্কা যে নবশক্তিদৃপ্ত সোভিয়েট রাষ্ট্র অপরকে অবহেলা করার ফলে হয়তো পৃথিবীতে নতুন সঙ্কট দেখা দিতে পারে। কিন্তু আশার কথা এই যে শিক্ষার প্রসারের ফলে সমাজের সকল স্তরেই আজ বিবেচনা করবার মতন লোকের সংখ্যা বেড়ে গিয়েছে। স্টালিনের আমলে যে একনায়কত্ব সম্ভব ছিল, আজ আর তা সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, যে নতুন নেতৃত্ব অনিবার্য ভাবে দেশের শাসনভার ক্রমশ অধিকার করছে, তাদের মধ্যে অধিকাংশই বিপ্লব-পরবর্তী যুগের গোষ্ঠী। তাই পূর্বকালের আশঙ্কা সন্দেহ বা বিদ্বেষ তাদের মনে ততটা সক্রিয় নয়, বৈজ্ঞানিক যুগের দৃষ্টিভঙ্গী দিয়ে তারা নতুন পৃথিবীর সমস্যা সমাধানের সাধনায় উদগ্রীব।

সোভিয়েট জনসাধারণ শান্তিকামী, অন্য দেশের প্রতি বন্ধুত্ব মনোভাবশালী—এবিষয়ে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। দুয়েক সপ্তাহের জন্যও যাঁরা সোভিয়েট রাষ্ট্রে গিয়েছেন, তাঁরাও শান্তির জন্য জনসাধারণের আকুল স্পৃহা উপলব্ধি করেছেন। রাষ্ট্রনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য, অর্থনৈতিক আদর্শের বৈষম্য ও অনেক ক্ষেত্রে রুষ জীবনদর্শনের অস্বীকৃতি সত্ত্বেও সোভিয়েট রাষ্ট্রে ভারতবর্ষের জন্য যে সম্প্রীতি, পণ্ডিত নেহরুর প্রতি যে গভীর শ্রদ্ধা, সোভিয়েট জনসাধারণের শান্তিকামনার কথা মনে না রাখলে তা বোঝা যায় না। পণ্ডিত নেহরু সোভিয়েট রাষ্ট্রে যে সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন, কোন সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতার ভাগ্যে তা জোটেনি। মিষ্টার ক্রুশ্চভের ভারতবর্ষে আগমনের পরেই যে সোভিয়েট নীতি বদলাতে সুরু করেছিল, এটাও আকস্মিক নয়। প্রাক-স্বাধীন ভারতবর্ষে সমস্যার অন্ত ছিল না। ১৯১৭ সালে রুষ সাম্রাজ্যের যে অবস্থা, তার তুলনায় ১৯৪৭ সালের ভারতবর্ষ প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পশ্চাৎপদ, কিন্তু স্বাধীনতালাভের সাত-আট বৎসরের মধ্যে ভারতবর্ষ যতখানি সিদ্ধিলাভ করেছিল, সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপনের পর কুড়ি বৎসরেও তা সম্ভব হয়নি, সে কথা মিষ্টার ক্রুশ্চভের মতন তীক্ষ্ণধী নেতার দৃষ্টি এড়ায়নি। তিনি আরো লক্ষ্য করেছিলেন যে আভ্যন্তরীণ শ্রেণীসংগ্রাম ও বহিঃশত্রুতা বর্জন করে সকলের সঙ্গে মিত্রতার পথে ভারতবর্ষ চলতে চেয়েছে বলে এদেশে অন্তর্দ্বন্দ্ব বহির্দ্বন্দ্বের তেমন কোন পরিচয় নেই এবং পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক দেশই ভারতবর্ষকে মিত্র হিসাবে গ্রহণ করেছে, ভারতবর্ষের পুনর্গঠনের কাজে ধনবল জনবল দিয়ে সাহায্য করতে চেয়েছে। মিষ্টার ক্রুশ্চভ আরো দেখেছেন যে এদেশের রাজা মহারাজা জমিদার তালুকদারের কায়েমী স্বার্থ লোপ পেয়েছে, কিন্তু তারা বিদ্রোহ না করে মনেপ্রাণে ভারতবর্ষের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। ভারতবর্ষ থেকে ফেরবার কিছুকাল পরেই মিষ্টার ক্রুশ্চভ ঘোষণা করেন যে যুদ্ধ অপরিহার্য নয়, শান্তির পথে গণতান্ত্রিক উপায়ে বিভিন্ন দেশ সমাজবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে, এবং সে সমাজের

রূপও বিভিন্ন দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের বিচারে বিভিন্ন হতে বাধ্য।

আজ সমস্ত পৃথিবীর মানুষ চায় যে যুদ্ধের আশঙ্কা চিরদিনের জন্য লুপ্ত হয়ে যাক। বিজ্ঞান আজ মানুষের হাতে যে শক্তি এনে দিয়েছে, সে শক্তির সদ্ব্যবহারে মানুষের সমস্ত অভাব অভিযোগ দূরে হয়ে ধরাতলে স্বর্গসম সমাজ প্রতিষ্ঠা আজ মানুষের করায়ত্ত। শক্তি অন্ধ; তাই সেই শক্তির যদি অপব্যবহার হয়, তবে মানবসমাজের ধ্বংস কেউ ঠেকাতে পারবে না। চল্লিশ বৎসরের শিক্ষাসাধনায় আজ সোভিয়েট রাষ্ট্র পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তি। সেই শিক্ষাসাধনার বিকাশে সোভিয়েট নাগরিক যদি আজ সমগ্র বিশ্বসমাজের প্রতি তার যে কর্তব্য, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে তার যে দায়িত্ব, তা পরিপূর্ণভাবে পালন করে, তবে পৃথিবীর ইতিহাসে সোভিয়েট রাষ্ট্র ও নাগরিকের দান চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

কবিতা

কিন্নর

প্রেমেন্দ্র মিত্র

নদীতে বাঁধানো ঘাট, সে তোমার, আমার, তাদের,
যারা শুধু ধাপে বসে বড় জোর শোভা দেখতে পারে
পূর্ণিমার খ্যাতি রাখতে। নইলে শুধু নৌকোয় বেসাতি
আকণ্ঠ বোঝাই করে ওপারের হাট বুঝে ছাড়ে।

আঘাটায় যায় না সেও। কিন্তু তার পায়ের তলায়
শান-বাঁধানো পইঠাগুলো দুলে ওঠে তরঙ্গে ইচ্ছার,
যেন কি ঠিকানা খুঁজতে যা কখনো পৌঁছোন জানে না।
তার কাছে সব নদী অচিরার সোহাগ সোচ্চার।

সময় শাসিত হোক, ধেনু ধান্যে পূর্ণ হোক ধরা
প্রাণের বিক্রম নিত্য দিগ্বিজয় ছড়াক উল্লাসে।
সে শুধু না নির্বাসিত হয়, যার উদ্ভৃত্ত মন
খোঁজে না আয়ুর উহ্য, ভ্রান্তিকেই সেধে ভালবাসে।

সে কোথাও দেয় না ডুব, নদীতে কি জীবনে, সৃষ্টিতে।
চায় না কিছুরই মানে, শুধু বোঝে মুহূর্ত-মর্মর,
ব্যাখ্যা নয় ব্যঞ্জনাই। প্রপঞ্চে সে স্বেচ্ছা প্রবঞ্চিত,
অবান্তর ক্ষণিকের নিরাসক্ত কামুক কিন্নর।

চেনা পাথর

বিষ্ণু দে

এ পাথরে,
এ জলেও, শুনেছি সেকালে পার্বনে উৎসবে
পুণ্য হত, বিশ্বাসী মানুষ দেখা পেত জাহ্নবীর,
পশ্চিমে যেমন সব পথে রোম মেলে।
শুনেছি এ জলে অন্তিমেও গঙ্গাযাত্রা সাঙ্গ হত
গঙ্গামায়ী হরহর বোমবোম রবে।

অন্তত এটুকু স্থির :
বহুকাল ধরেই নিয়ত এই নদী আমার ঐতিহ্য পরম আত্মীয়,
আত্মীয় এ রৌদ্রেজলে মসৃণ অথচ কঠিন পাথর।
ঢালু পাড়, তিতিরের ঝোপঝাড়, বালি আর পাথরে পাথর,
আর শাল পিয়াল পলাশ পিয়াশাল গমহার শিমুল,
আর পাতার মর্মর আর ফুল আর পাখী, গাছে জলে—
এ নদী চোখের প্রিয়, কাণের প্রাণের
আনন্দ, আরাম, শান্তি।

শৌখীন? তা বটে,
শহরের পলাতক হৃদয়বিলাস— যাতে কটা দিন সভ্যতার ভুলভ্রান্তি—
ক্রমেই যা তীব্র হয়, প্রায় অগোচরে সাপ কিংবা ইঁদুরের মতো,
জীবনসঙ্কটে
যেমনটা হয় অন্নবস্ত্র সবেতেই মূল্যবৃদ্ধি দিনে দিনে—
যাতে কটা দিন সভ্যতার গৃধ্নুতার পাপ
শস্তার টিকিট কিনে
আমাদেরও অংশীদারী অনুতাপ আরামে জানাই
নিসর্গের রূপসঙ্গে, প্রকৃতির মানবিক গুণে।

আমার আত্মীয় এই সজল পাথর,
আজ ডোবে ঘুমের কল্লোলে, কাল জাগে নির্ণিমেষে,
গড়ন ধরণ এর চাহনি মেজাজ দেখে শুনে ক্লান্তি নেই,
কখনও নিকষকালো কঠিন কর্কশ পরাজয়হীন,
কখনও ধূসর সহঅবস্থানে কিংবা সহিষ্ণু আবেগে রৌদ্রে থরথর
পিঙ্গল জটার মতো,
অথবা কখনও জ্বলে মধ্যাহ্নের হিলিঅমে হীরকফলনে

তৃতীয় নয়নে যেন দক্ষের যজ্ঞের দিন—এই পার্বতীর দেশে
সাধারণ মানুষের স্মৃতির তো ক্ষান্তি নেই।
শুনেছি, সেকালে ইনিই ছিলেন এ সুস্বার পুণ্যতোয়া খরস্রোত,
বালিতে পাথরে তারপরে
সাত আট পুরুষে নাকি বছরে বছরে
জল কমে, চর পড়ে, কাদা বাড়ে, পাহাড় পর্বত নুয়ে পড়ে ক্ষ'য়ে ক্ষ'য়ে
—যেমনটা অন্নবস্ত্রে টান পড়ে যত চক্রে মূল্য বাড়ে—
গ্রামে তাই কিচ্ছা করে সন্ধ্যায় নির্ভয়ে :
এ নাকি দেশের পাঁচশালা খেসারৎ!

আমার একান্ত প্রিয় এই নদী, ঢালুপাড়, রঙের বাহার, ধ্বনি,
বালি, জল, বনানী, প্রান্তর, সখ্যে বাঁধা পাথর পাহাড়।
আমি দেখি এই চেনা সাতনরী পাথরের গায়ে
বিস্মিত আমারই মন প্রাণ সকালে দুপুরে বিকালে সন্ধ্যায় সারাদিন।
আর স্তব্ধ গ্রাম্য রাত্রে শুনি ক্ষেতের আড়ালে, নক্ষত্রপ্রহরী
সর্বকালে পরাজয়হীন জলস্রোতে পাথরের গান॥

যেতে যেতে

হরপ্রসাদ মিত্র

কিছু পথ পেরিয়েছি ঘুমোতে ঘুমোতে,
জেগে দেখি হাসিখুশি রোদের চুমোতে—
গাছেরা উঠেছে সেজে সবুজ পাতায়,
শাদা মেঘ জমে আছে নীলের হাতায়,
পাহাড়ের পায়ে পায়ে কয়েকটি গ্রাম
জীবনেও জানবো না কী তাদের নাম!

এদিকে বিষাদ জমে, বিবাদ ঘনায়।
কেবলি ভাঙছে ঘুম জগৎদোলায়।
হীরের আংটি হাতে হিহি জল্লাদ
হাসিতে রেখেছে ঢেকে রাক্ষুসে দাঁত।
হিংসের ঝক্‌মক্‌ যশের চূড়োয়
সেখানে আদর্শেরা সহজে গুঁড়োয়।

জীবনের এইসব চড়াই তরাই—
খেলনার জৌলুষে ভুলোনো, ভোলাই।
এ জীবন কোনো এক লক্ষ্যের দিকে
চলছে কি? চলছে কি? প্রশ্নটা ফিকে—
মাঝে মাঝে জ্বলে ক্ষীণ, মাঝে মাঝে নেভে;
কোথায় সে মন বলো যে এখানে দেবে—
বাঁচবার বিশ্বাস; মৃত্যুর মানে—
জীবন সফল হবে দানে-প্রতিদানে?

নামহারা স্মৃতি আর কথাহারা রূপ
ঝিলকিয়ে দেখা দেয়, বলে চুপ্‌, চুপ!

মন্‌ও মুহূর্ত

জ্যোতির্ময় রায়

বাবা মারা গেছেন জন্মের কিছুকাল পরেই। বুকে আঁকড়ে ধরে মা বড় করে তুললেন মাত্র দশটি বছর। তারপর তাঁকে চলে যেতে হল। একমাত্র ভাই মহীতোষের দুটি হাত ধরে তাঁর কোলে তুলে দিয়ে গেলেন অনিতাকে। মহীতোষের নিজের সন্তান চারটি। এই চারটি সন্তানকেই ভালমতো মানুষ করে তোলার সংস্থান তাঁর ছিল না। তার ওপর অনিতার দায় এসে পড়লো তাঁর কাঁধে। তবে কিনা দায় যারা নেয় তারা স্বভাবেই নেয়, সংস্থানের কথা ভাবে না। মহীতোষও ভাবলেন না। দিনরাত্রি অসীম পরিশ্রম করে নিজের সন্তান ক'টির সঙ্গে মানুষ করে তুললেন অনিতাকে। মহীতোষের স্ত্রী স্মৃতিকণাও অতি ভালমানুষ। স্বামীর সঙ্গে বিনা দ্বিধায় বুকে তুলে নিলেন অনিতাকে।

মা বাবার কথা খুব একটা মনে পড়ে না অনিতার। প্রতি বছর পড়াশোনায় ভাল ফল করে ধাপের পর ধাপ এগিয়ে চলেছে সে। কিন্তু সংসারের অভাবটা থেকে থেকে যখন তীব্র হয়ে ওঠে বড় কষ্ট হয় তার। সে স্থির করে এম. এ. পরীক্ষাটা দিয়ে একটা ভাল চাকরি নিয়ে মামাকে সাহায্য করবে। মামাকে সে বলেও সে কথা। পিঠে চাপড় দিয়ে হাসতে হাসতে মহীতোষ বলেন, বেশ বেশ, আমি তো বেঁচে যাই তাহলে। মুখে বলেন বটে, কিন্তু মনে অনিতার একটি ভাল বিয়ে দেবার কথাটাই বড় হোয়ে থাকে।

অনিতা রীতিমতো সুন্দরী। তার ওপর স্বভাবটিও হোয়েছে শান্ত মধুর। স্মৃতিকণা বলেন, এ মেয়ে যে সংসারে যাবে, সেখানে সকলকে সুখী করতে পারবে। নিজেও সুখী হবে। তা ছাড়া বিয়ে দিয়ে সুন্দর একটি সংসার গড়ে দিতে না পারলে এতদিন এত কষ্ট করে বড় করে তোলার সার্থকতাই বা কোথায়?

মহীতোষ অনিতার জন্যে সুপাত্রের সন্ধানে লেগে যান। অনিতাকে এ বিষয়ে কিছু বলবার প্রয়োজনবোধ করেন না তাঁরা। কারণ তাঁরা জানেন অনিতা কখনো তাঁদের অবাধ্য হবে না।

পাত্র একটি পাওয়া গেল। মহীতোষের অবস্থা অনুযায়ীও বটে। দাবীদাওয়া কিছুই নেই। এম. এ. পাশ ছেলে। ব্যবসা ক'রে ভালই উপায় করছে। সংসার বলতে দুটি মাত্র ভাই। নির্ঝঞ্ঝাট।

মহীতোষ দিন স্থির করলেন অনিতাকে একদিন দেখে যাবার।

সারা দুপুর বসে সাধ্যমতো অতিথি আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন স্মৃতিকণা।

প্রথমটা ঠিক ধরতে না পারলেও পরে অনিতা সবই বুঝতে পারলো। কিন্তু মামা যা স্থির করেছেন, তার ওপর কিছু বলার কথা সে ভাবতে পারে না। নতুন একটা জীবনে তাকে ঢুকতে হবে এই চিন্তার অস্বস্তি নিয়ে কাটিয়ে দিলো দুপুরটা।

বিকেল না হতেই আলমারী খুলে ভাল একখানা শাড়ী বার করে দিয়ে মামী বললেন, —মুখ হাত ভাল ক'রে ধুয়ে কাপড়টা পাল্টে নে। তোর মামার কাছে একজন আসবেন, তোর সঙ্গে আলাপ করতে।

মামীর বলার ধরনে মনে মনে একটু হাসলো অনিতা। তারপর তাঁর কথামতো

সামান্য একটু প্রসাধন সেরে তৈরী হ'য়ে নিলো সে। বারো বছরের মামাতো বোন হাসি হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধ'রে কানে কানে বললো, দিদিরে, তোর বিয়ে! বলেই হাসতে হাসতে ছুটে পালালো।

হাসির মুখে কথাটা শোনামাত্র বুকটা কেমন একবার দুলে উঠলো অনিতার। 'বিয়ে' শব্দটার একটা স্বাদ আছে, এটা যেন মুহূর্তে মনের ওপর দিয়ে পার হোয়ে গেলো একবার। নাঃ সময় যতই এগোচ্ছে বুকটা কেমন যেন করছে। অন্যমনস্ক হবার জন্যে একটা বই খুলে বসলো অনিতা।

কিছুক্ষণের মধ্যে হন্তদন্ত হোয়ে তার সামনে দিয়ে মহীতোষ এগিয়ে গেলেন রান্নাঘরের দিকে স্ত্রীকে খবর দিতে, ভদ্রলোক এসেছেন।

চা জলখাবার ষ্ট্রেতে ভাল করে সাজিয়ে ছোক্‌রা চাকরের হাতে দিয়ে বাইরের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন স্মৃতিকণা।

মহীতোষ এসে অনিতাকে ডাকলেন,—আয় আমার সঙ্গে।

কলেজে ছেলেদের দেখেছে প্রতিদিন। কথাবার্তা না হোয়েছে এমনও নয়। কিন্তু অনিতা বরাবরই রীতিমতো একটা দূরত্ব রেখে চলেছে তাদের সঙ্গে। কোনো কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে প'ড়ে মামাকে বিব্রত করার কথা ভাবতে পারেনি সে। আজ এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা হবে।

মামার পেছন পেছন অনিতা গিয়ে ঢুকলো বাইরের ঘরে।

তাদের ঢুকতে দেখেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ভদ্রলোকটি। হাত তুলে নমস্কার করলো অনিতাকে, প্রত্যভিবাদন জানাতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যে যেন থম্‌কে গেলো অনিতা। ভদ্রলোক সোজা তাকিয়ে আছে তার চোখের দিকে। দৃষ্টিটা একটু তীক্ষ্ণ, মনে হয় ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে। কিন্তু—কিন্তু কি অপরূপ চেহারা! ব্যক্তিত্বের সঙ্গে এমন রূপ অনিতা আর দেখেনি কোথাও।

—আয় বোস ওখানে। লোকটির মুখোমুখি বেতের চেয়ারটা দেখিয়ে দিলেন মামা। —বসো হে সুরজিৎ।

মামার কথামতো ধারে এগিয়ে গিয়ে বসলো অনিতা।

অনিতা বসলে পর সুরজিৎ বসলো।

কয়েক মুহূর্ত সবাই চুপচাপ। মহীতোষ বুঝলেন এ সব প্রশ্নোত্তরের জন্যে খানিকটা সহজ অবকাশের প্রয়োজন। তাই তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, —তোমরা আলাপ সালাপ করো, আমি আসছি একটু ভেতর থেকে। অনী, তুই চা-টা ঢেলে দে। চলে গেলেন মহীতোষ।

অনিতা হাত বাড়িয়ে টি পটটা নিলো। রোজ সে-ই বাড়ীর সবাইকে চা করে খাওয়ায়। আজ হাতটা এমন কাঁপছে কেন! ফিফ্‌থ্‌ ইয়ারে পড়ে সে। একজন ভদ্রলোকের সামনে বসে এভাবে ঘামছেই বা কেন! নিজের ওপরেই রাগ হয় অনিতার। কেন সে বেশ সহজ হোতে পারছেনা? আর প্রথম দেখেই মানুষটিকে এমন ভালই বা লাগছে কেন! তবে কি বিয়ের জন্যে মনটা তার প্রস্তুতই ছিলো! জোর করে নিজেকে একটু সামলে নিয়ে চা ঢেলে এগিয়ে দিলো সে সুরজিতের সামনে।

সুরজিৎ আর একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টি বুলিয়ে নিতে গেলো অনিতার মুখের ওপর দিয়ে, সেই মুহূর্তেই অনিতাও তাকালো চোখ তুলে। উভয়ের দৃষ্টি মিলিত হলো। অনিতা

চোখ নামিয়ে নিলো।

—আপনার বুঝি আরও পড়বার ইচ্ছে ছিলো? অনেকই তো পড়েছেন, আর কি দরকার, চাকরি তো আর করতে যাচ্ছেন না।

মুখে মৃদু হাসি টেনে খুবই স্বচ্ছন্দ আর সুন্দরভাবে কথা বলছে সুরজিৎ। শুনতে ভাল লাগছে অনিতার।

—চাকরিই করবো ভেবেছিলাম। খুবই ছোট থেকে মামা কত কষ্টের ভেতর দিয়ে মানুষ করলেন। তাঁর সংসারে কিছু কাজে লাগবো এই ছিল ইচ্ছে।

—তা সে তো বিয়ে করেও কাজে আপনি লাগতে পারেন। আপনি অর্থের কথা যদি বলেন, তো আমি কথা দিচ্ছি সেদিক দিয়ে কোনো অসুবিধেই হবেনা আপনার।

'আমি' কথাটার ওপর বেশ একটু জোর দিলো সুরজিৎ।

অনিতার মনটা কেমন কৃতজ্ঞ হোয়ে উঠলো লোকটির সম্পর্কে। আর কোনো কথাই সে বললো না।

সুরজিৎও নীরবে খাওয়া শেষ করে বললো,—আচ্ছা, আর আপনাকে আটকে রাখবো না। আপনি গিয়ে মামাকে একটু পাঠিয়ে দিন।

অনিতা দুহাত তুলে নমস্কার জানিয়ে ধীর পায়ে ভেতরে চলে গেলো।

মহীতোষের সঙ্গে কথা পাকা করে চলে গেলো সুরজিৎ।

দশদিন পর বিয়ে।

মহীতোষ সাধ্যমতো কেনাকাটি সুরু করলেন। সুরজিৎ বিশেষ জোর দিয়ে বলে গেছে, নেহাৎ আত্মীয়ের মধ্যে যাদের না বললেই নয়, তাদের ডেকে খুবই সংক্ষেপে বিয়েটা যেন সারা হয়। বরযাত্রীও আসবে মোট আটজন। অনিতার আড়ম্বরহীন বিয়ের কষ্ট সে পুষিয়ে দেবে বৌভাতের আয়োজন দিয়ে।

তাঁর এত আদরের অনিতার জন্যে এমনি একটি পাত্র পাবেন মহীতোষ ধারণাই করতে পারেন নি।

আর এই দশটা দিন অনিতার যে কি করে কাটলো সে নিজেই জানে না। বইতে মন বসে না। রাতে ঘুম হয় না। একটি মুখ, কয়েকটি কথার টুক্‌রো এই যেন ভরিয়ে রেখেছে তার মন, কান।

আজ অনিতার বিয়ে। সকালে বিস্তৃত আয়োজন নিয়ে বিরাট অধিবাস এলো অনিতার। আত্মীয়স্বজন ভাইবোন সবাই হৈ হৈ করতে লাগলো।

সংক্ষিপ্ত আয়োজনের মধ্যেও সানাইটা বাদ দেন নি মহীতোষ। সানাই-এর চেরাকণ্ঠে আশাওরীর অতুলনীয় মাধুর্য আর বাড়ীর সবার আনন্দের মাঝে ব্যস্ত হোয়ে হুটোপুটি করছেন মহীতোষ আর স্মৃতিকণা।

পাশেই বাড়ীওয়ালার দোতলা বাড়ী। তাঁর ছাদটি আজকের জন্যে মহীতোষকে ছেড়ে দিয়েছেন সদাশয় বেণীমাধববাবু। তারই একটা ভাগে বিয়ের আসর করা হোয়েছে, বাকী অংশে খাওয়ার ব্যবস্থা।

অনিতার কলেজের পাঁচটি বান্ধবী এসেছে সন্ধ্যার একটু আগে। নানা পরামর্শের পর সবাই মিলে এটা-ওটা করে রাজরানীর মতো সাজিয়ে তুললো অনিতাকে। একজন গিয়ে ব্যস্ত স্মৃতিকণাকে হাত ধরে টেনে এনে দেখালো কেমন হয়েছে সাজ।

স্মৃতিকণা অনিতার চিবুকটা তুলে ধরে মুগ্ধচোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে থাকতে

ঝর্‌ঝর্‌ করে কেঁদে ফেললেন। অনিতার চোখদুটিও জলে ভরে উঠলো। বন্ধুরা পরিস্থিতিটি তরল করতে হৈ হৈ করে উঠলো। —এই এই, মামীমা দিলেন তো কাঁদিয়ে, সব পাউডার উঠে যাবে, কাজল নষ্ট হোয়ে যাবে।

ওদের কথার ধরনে হেসে ফেললেন স্মৃতিকণা। চোখ মুছে ব্যস্তপায়ে চলে গেলেন নিজের কাজে।

হঠাৎ জোরে সানাই বেজে উঠলো সঙ্গে সঙ্গে শঙ্খ, উলুধ্বনি আর বর এসেছে, বর এসেছে শুনে দুম্দাড় করে অনিতার বন্ধুরা ছুটলো বাইরে অনিতাকে একা রেখে।

আর বুকটা জোরে জোরে ধক্‌ ধক্‌ করতে সুরু করলো অনিতার। বরবেশী সুরজিতের চেহারা ভেসে উঠলো কল্পনায়। আনন্দে, একটা অজানা ভয়ে অনিতা যেন চেতনার বাইরে চলে গেলো।

—ওমা গো, কি চমৎকার দেখতে হোয়েছে রে তোর বর! বন্ধুরা খুসীতে উচ্ছল হোয়ে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলো অনিতাকে।

তপতী বললা, —হাঁ ভাই আমরা ছজন মিলে বিয়ে করতে পারিনা তোর বরকে? আমি যাই, মামাবাবুকে বলি গিয়ে। এমন গম্ভীরভাবে কথাটা বললো সে, যে সবাই হেসে গড়িয়ে পড়লো।

ব্যস্তভাবে কয়েকজন বর্ষীয়সী আত্মীয়া এসে ঢুকলেন ঘরে। একজন বললেন, —চলো মা, তোমরা ওকে নিয়ে ও বাড়ীতে চলো।

বিয়ের অনুষ্ঠানের মধ্যে তীব্র ইচ্ছে সত্ত্বেও অনিতা কিছুতেই মুখ তুলে তাকাতে পারলো না। কি যেন একটা পরম ভাললাগার জিনিসকে সে সযত্নে বাঁচিয়ে রাখছে একান্তে উপভোগ করবে বলে।

এলো শুভদৃষ্টির পালা। পাত্‌লা একটা বেনারসী ওড়নার চারটে কোন্‌ চারজন এয়োতে মিলে টেনে ধরলো বর-বধূর মাথার ওপর দিয়ে। চারিদিকে ঘিরে রয়েছে আত্মীয়, আত্মীয়া ও নিমন্ত্রিতেরা। এক কোণে থোকা বৌ'ধে ঝুঁকে রয়েছে বন্ধুদের পাঁচটি মুখ। মহিলাদের মধ্যে থেকে বয়স্কারা দুচারজন বর-বধূকে বলছেন, —তাকাও তাকাও, চোখ তুলে ভাল করে চাও।

ধীরে টানা দুটি চোখ তুলে মুখোমুখি দাঁড়ালো মানুষটির চোখের দিকে তাকালো অনিতা। একি! বিস্ময়ে বেদনায় কাঠ হোয়ে গেলো অনিতা। দম আটকে আসছে তার, কি করবে সে, মাথা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে—অজ্ঞান হয়ে যাবে নাকি? এক লহমায় যাকে দেখলো অনিতা, এ তো সে নয়। ভারী ছেলেমানুষী এর মুখের ভাব। টকটকে রঙ। পাত্‌লা লাল ঠোঁট দুটিতে ফুটে আছে একটু হাসির ভাব। তাকিয়ে আছে সে অনিতার দিকে। চোখের দৃষ্টিতেও ছেলেমানুষী ভরা।

সে কই! দশটা দিন ধরে দিনরাত যার কথা ভেবেছে অনিতা। এ কে! মুখের ভাবটা একেবারে উল্টো হলেও চেহারায় খুবই মিল আছে তার সঙ্গে। তবে কি সুরজিত তার ভাইয়ের জন্যে তাকে দেখতে এসেছিল? কেন সে কথাটা তাকে আগে কেউ জানালো না?

এত কথা যে পরিচ্ছন্ন মতো ভাবতে পেরেছে অনিতা তা নয়। কারণ ঠিক ঠিক কিছু ভাববার মতো মনের অবস্থা তার ছিল না। ও ধরনের আবছা কতগুলো ধারণা ঝড়ের বেগে তার মনের ওপর দিয়ে পার হয়ে গেলো মাত্র।

এর পর কখন কি ভাবে বাসর ঘরে গিয়ে সে বসেছে, কিছুই তার স্পষ্ট মনে পড়ে না।

কিন্তু যা হবার তা ঘটে গেছে। জীবনের এই গুরুতর অধ্যায়কে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই। অনিতাও মেনে নেবে, মন থেকে কাঁটা দিনের অপেক্ষমান আকাঙ্ক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে মুছে ফেলে। জোর করে মনটা প্রস্তুত করতে চেষ্টা করলো অনিতা। আশ্চর্য, বিয়ের চিঠিটাও সে দেখলো না একবার। তাহলে তো আজ আচম্‌কা এমন আঘাতটা তাকে পেতে হতো না।

বন্ধুরা সুকুমারকে নিয়ে নানা রকম ঠাট্টা সুরু করেছিলো সুকুমারও পাল্টা তাদের এমনই জব্দ করতে লাগলো, যে হেসে হেসে তারা এ ওর গায়ে গড়িয়ে পড়লো।

মামী এসে বললেন, —ওরে এবার তোরা ওদের ছেড়ে দে। আর একটু দুষ্টুমি করে বিদায় নিলো তারা।

সসম্ভ্রমে সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, —আচ্ছা, দাদা কি চলে গেছেন?

—না বোধহয়, আমি দেখছি—বলে মামী পেছন ফিরেই—এই যে—বলে মাথার কাপড়টা একটু টেনে সরে গেলেন।

এগিয়ে এলো সুরজিৎ। —চলিরে সুকু, কাল বিকেল চারটের সময় গাড়ী পাঠাবো। বৌ নিয়ে যাবি।

সুকুমার দাদাকে প্রণাম করলো। বেশ কিছুক্ষণ তার মাথায় হাত রেখে দাঁড়ালো সুরজিৎ। প্রাণহীন কলের পুতুলের মতো এগিয়ে গেলো অনিতা। প্রণাম করলো সুরজিৎকে। আল্‌তোভাবে তার মাথায় হাত রেখে অস্ফুটকণ্ঠে আশীর্বাদ করলো সুরজিৎ।

মহীতোষের ছোট বাড়ীটিরই একটা ঘরে সাজিয়ে গুছিয়ে বাসর করা হোয়েছে।

রাত প্রায় দেড়টা বাজে। খাটে বসে আছে অনিতা।

হাতের সিগারেটটা ফেলে দিয়ে হাসিমুখে পাশে এসে বসলো সুকুমার।

—কথা বলবেনা?

—কি বলবো?

—সত্যি, কি যে বলা যায় আমিও ভেবে পাচ্ছি না কিছু। কিন্তু খুব ইচ্ছে করছে বলতে অনেক কথা। তবে একটা কথা বলতে পারি, দাদা আমার জন্যে প্রায় রাজকন্যা খোঁজার মতো বেরিয়ে ছিলেন, বৌ খুঁজতে। অনিতার হাতের ওপর হাত রেখে বললো, আর সত্যিই আমি তাই পেয়েছি। তুমি কি বলো, ঠিক না?

সরলভাবে বলে যাওয়া সুকুমারের কথাগুলো শুনে মৃদু হাসলো অনিতা। বললো, —আমার সম্পর্কে অতবড় ধারণা আমি কি করে করবো? আপনি সুখী হলেই আমি সার্থক।

—আপনি! না ওসব চলবে না, তুমি বলো। এক্ষুণি বলতে হবে, নইলে আমি তোমার সাজ নষ্ট করে দেবো। অনিতার মাথার কাপড়টা টেনে ধরলো সুকুমার।

অনিতা তার ছেলেমানুষী দেখে হেসে ফেললো। —আচ্ছা আচ্ছা, তুমি। কি একটু ভেবে নিয়ে বললো, —আচ্ছা, আমাকে দেখতে তুমি আসোনি কেন?

—তা কি হয়? দাদা থাকতে আমি আসবো আমার জন্যে কনে দেখতে? দাদার কথা বলতে গিয়ে সুকুমারের ছেলেমানুষী ভাবটা চলে গেলো। একটু চুপ করে থেকে বললো সে, —দাদার সম্পর্কে একটা কথা তোমাকে আমার বলবার আছে। তোমার মামা

সবই জানেন। তোমারও জানা দরকার। মা মারা যাবার কয়েক মাসের মধ্যেই ধরা পড়লো দাদার টি. বি.। চিকিৎসার কিছুই বাকী রাখলেন না বাবা। জলের মতো অর্থ ঢেলে গেলেন। চার বছর ভুগে দাদা সেরে উঠলেন, কিন্তু এত বড় আঘাতটা বাবা সইতে পারলেন না। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই মারা গেলেন। দাদার বেশী খাটুনি সইবে না বলে বাবার কারবার সব আমিই দেখি। যদিও উনি এখন একেবারেই ভাল হোয়ে গেছেন, ডাক্তার বলেন বিয়েও করতে পারেন। কিন্তু তা তিনি করবেন না। অসুখটা নিয়ে একটা বাতিকের মতো দাঁড়িয়ে গেছে। প্রত্যেক তিনমাস অন্তর ডাক্তার দেখানো, ওষুধ খাওয়া, যত রকম সাবধানতা আছে সবই এখনও একইভাবে মেনে চলেন। আমি ছাড়া এতবড় স্নেহের পাত্র তাঁর নেই। তুমি দাদাকে যত্ন করবে। তাঁর সমস্ত ভার হাতে তুলে নেবে, এই আমি চাই।

দম বন্ধ করে অনিতা শুনলো সুরজিতের সব কথা। মাথা হেলিয়ে জানালো সুকুমার যা বলছে, সে তাই করবে।

অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই সুকুমার তার মিষ্টি সুন্দর স্বভাবে আর ছেলেমানুষী দুরন্তপনায় সম্পূর্ণভাবে জয় করে নিলো অনিতাকে। অনিতা সত্যিই সুখী হয়েছে। সুরজিতের সব রকমের সেবা যত্নের ভার সে হাতে তুলে নিয়েছে। রাত্রে নটায় শুয়ে পড়ে সুরজিৎ। তার আগে কিছুক্ষণ বই পড়ার অভ্যাস। অনিতা আসার পর থেকে সেই পড়ে শোনায়, সুরজিৎকে নিজে পড়তে দেয় না। দুটো থেকে তিনটে পরিচ্ছেদ পড়া হলে একগ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়ে সুরজিৎ। মশারী ফেলে গুঁজে দিয়ে, বাতি নিভিয়ে চলে আসে অনিতা নিজের ঘরে। দুটি ঘরের মাঝে মস্ত দরজাটা আস্তে ভেজিয়ে দেয়।

সংসারের এদিকটা কাটে এমনি ঠাণ্ডা ভাবে। কিন্তু অন্যদিকে সুকুমারের দৌরাত্ম্যে এক এক সময় হয়রান হোয়ে পড়ে সে। হয়তো বা স্নান সেরে চুল আঁচড়াচ্ছে অনিতা ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে, কোত্থেকে চুপিচুপি এসে ঝপ করে দু হাতে অনিতার পাতলা শরীরটা পাঁজকোলা করে তুলে নিয়ে রওনা হবে খাবার ঘরের দিকে।

ছট্‌ফট্‌ করে অনিতা, —আঃ কি হচ্ছে, ছেড়ে দাও লক্ষ্মীটি, চাকর বাকর ভাববে কি?

—কি আবার ভাববে, তুমি আমার বৌ না? সহজকণ্ঠে জবাব দেবে সুকুমার।

খেতে বসে নিজের যেটা ভাল লাগবে, একহাতে জড়িয়ে ধরবে অনিতাকে অন্য হাতে জোর করে দেবে সেটা অনিতার মুখে গুঁজে। একদিন তো বুড়ো চাকর শশীর সামনেই এই কাণ্ড। লজ্জায় অনিতা কি করবে ভেবে পায়না। ভৃত্যটিই বাঁচায় তাকে। সুকুমারকে কোলে পিঠে করে মানুষ করেছে সে। বলে, তুমি লজ্জা পেওনি বৌমা, আমার ছোট্‌দাবাবু চিরকাল ওই এক রকম। ছোট থাকতে আমাকেই কম জ্বালিয়েছে!

রাত্রে সুরজিৎ বিছানায় বসেছে বালিশে হেলান দিয়ে। খাটের পাশে গদীমোড়া চেয়ারে বসে একটা বিখ্যাত ইংরিজী উপন্যাস পড়ে শোনাচ্ছে অনিতা। জোর করে বইয়ের মধ্যে চোখ গুঁজে থাকে অনিতা। সে যেখানে বসে সেখান থেকে দরজা দিয়ে তাদের ঘরের মাঝামাঝি বসানো সুকুমারের ইজিচেয়ারটা দেখা যায়। সুরজিতের দৃষ্টি এড়িয়ে মুহূর্তের জন্যেও যদি তার চোখটা সে দিকে যায় তো দেখবে সে, তার দিকে তাকিয়ে কতরকমই না ভঙ্গী করছে সুকুমার। কখনও মস্ত হাই তুলে তুড়ি দিচ্ছে, কখনও হাতের ভঙ্গী করে ডাকছে কখনও বা আর কিছু।

ঘরে ঢুকে কপট রাগে ফেটে পড়ে অনিতা। —তুমি অমন করলে আর আমি দাদাকে

বই পড়ে শোনাবো না। এমন একটা দুঃখের জায়গা পড়ছিলাম। তোমার কাণ্ড দেখে হাসি চাপতে গিয়ে প্রাণ বেরোয় আর কি। একদিন হেসে ফেললে কি কেলেঙ্কারীটাই হবে বলতো?

অনিতা কথা সুরু করার সঙ্গে সঙ্গেই ভীষণ ভালমানুষী মুখের ভাব করে চেয়ারে উঠে একটু ঝুঁকে বসেছিলো সুকুমার। কথা শেষ হতেই পাখার হাওয়ায় উড়তে থাকা অনিতার শাড়ীর আঁচলটা ধরে এমন একটা হ্যাঁচকা টান দিলো, আচম্‌কা টাল সামলাতে না পেরে হুড়মুড় করে অনিতা পড়ে গেলো একেবারে সুকুমারের গায়ের ওপর। ততক্ষণে ওকে বুকের ওপর চেপে ধরেছে সুকুমার।

ছাড়া পেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে অনিতা বলে, —জন্মে দেখিনি বাবা এমন ছেলেমানুষ। মুখ গম্ভীর করে সে, —আচ্ছা, তোমার কি বয়স টয়স হবেনা কোনোদিনই?

চট্‌ করে নীচের ঠোঁটটা ভেতর দিকে ঠেলে বুড়ো মানুষের ভঙ্গী করে কাঁপা কাঁপা গলায় বলে ওঠে সুকুমার, —চলো গো খেতে চলো।

খিল খিল করে জোরে উঠেই অনিতা তাকায় দরজাটার দিকে। ও ঘরে সুরজিৎ ঘুমিয়ে পড়েছে কিম্বা পড়েনি, এত জোরে হাসা ঠিক হল না।

কিছুদিন ধরে অনিতার মনে হচ্ছে সুকুমার আর তাকে একসঙ্গে খুব হাসতে দেখলে বা একটু ঘনিষ্ঠভাবে কথা বলতে দেখলে সুরজিৎ যেন মুহূর্তের জন্যে একটু গম্ভীর হয়ে যায়। সুকুমারও লক্ষ্য করেছে নিশ্চয়ই। কারণ যত ছেলেমানুষীই করুক, দাদার সম্পর্কে নজরটা তার সব সময়ই সজাগ থাকে। একদিন বলেওছে অনিতাকে, —আমাদের জীবনটা দেখে দাদার বোধহয় বিয়ে করতে ইচ্ছে হয়, কিন্তু করবেন না। ভারী কষ্ট হয় ওঁর কথা ভেবে।

কদিন ধরে অফিসের একটা কাজ নিয়ে বড় বেশী ব্যস্ত হোয়ে পড়েছে সুকুমার। বাড়ী ফিরতে প্রায়ই নটা-দশটা বেজে যায়। আজও সুরজিৎ এসে জানালো সুকুমারের ফিরতে দেরী হবে। নিজের একটা কাজে সুরজিতকে যেতে হয়েছিলো সুকুমারের অফিসে দুপুর বেলা।

প্রতিদিনের মতো আজও সুরজিৎ আগেই খেয়ে নিলো। সামনে বসে যত্ন করে খাওয়ালো অনিতা।

সুরজিৎ এসে বসলো খাটে বালিশে হেলান দিয়ে। চেয়ার টেনে অনিতা বসলো বই নিয়ে। কিছুদূর পড়া হতেই বাধা দিলো সুরজিত, —থাক্‌, আজ আর পড়া ভাল লাগছে না।

অনিতা বই বন্ধ করে তাকালো তার দিকে। জানলার দিকে চেয়ে অন্যমনস্কভাবে কি যেন ভাবছে সুরজিৎ।

হঠাৎ ভারীগলায় বললো, —আলোটা নিবিয়ে দাও অনিতা।

বিস্মিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকালো অনিতা। এ কি বলছে সুরজিৎ!

—আলোটা নিবিয়ে দাও। আবার বললো সুরজিৎ।

তার এই কণ্ঠস্বরকে অমান্য করা অনিতার পক্ষে সম্ভব হল না। বই রেখে সুইচটা বন্ধ করে দিয়ে সেখানেই সে একটু থামলো। কি করবে কিছু ভেবে পাচ্ছে না।

—চেয়ারটা টেনে ওই জানলার সামনে বসো।

পূর্ণিমার চাঁদের আলো জানলা দিয়ে এসে পড়েছে খাট অবধি।

অনিতা যন্ত্রচালিতের মতো চেয়ার টেনে জানলার সামনে বসলো।

—তুমি গাইতে জানো?

—সামান্য। নিজে থেকে যেটুকু শেখা—তাই।

—গাও তো একটা—

খুবই নীচু গলায় মিষ্টি স্বরে গান গাইলো অনিতা।

গান শেষ হলে সুরজিৎ বললো, —সিগারেটের টিনটা কাছে এগিয়ে দাও।

—আপনি আর সিগরেট খাবেন? সাবধান করার জন্যেই কথাটা বললো অনিতা, কিন্তু এগিয়ে দিলো টিন, লাইটার, ছাইয়ের বাটি।

—খাই একটা। বেশ ভাল লাগছে। সিগরেট ধরিয়ে ধীরে ধীরে দুটো টান দিয়ে গভীর কণ্ঠে ডাকলো সুরজিৎ, —অনিতা!

অনিতার বিস্ময় শুধু বাড়ছেই। আজ সুরজিতের এ কি ভাব! চুপ করে সে অপেক্ষা করে রইলো কিছু শোনার জন্যে।

—অনিতা, একটা কথা জিজ্ঞেস করবো, সত্যি জবাব দেবে?

—আপনার কাছে আমি অসত্য বলতে পারি না। কি বলছেন বলুন? চাঁদের আবছা আলোয় সুরজিতকে যেটুকু দেখা যাচ্ছে সেদিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেললো অনিতা।

—আমি যেদিন তোমাকে দেখতে গেলাম, সেদিন আমাকেই তুমি পাত্র বলে মনে করেছিলে, তাই না?

উঃ, এ কি করছে সুরজিৎ! যে কাঁটাটা কত চেষ্টায়, কত যত্নে মনের কোন্ অতলে ঠেলে রেখেছিলো সে, কেন সেটা অমন নিষ্ঠুরের মতো টেনে বার করে আনতে চাইছে সুরজিৎ?

—কই কিছু বলছো না যে, জবাব দাও আমার কথার।

—আপনি যা বলছেন তা সত্য।

—হুঁ, একটা নিঃশ্বাস ফেললো সুরজিৎ। বললো, —আমি কখনো বিয়ে করবো না এইটাই স্থির। কিন্তু তোমাকে দেখে প্রথম আমার সেদিন মনে হোয়েছিলো, জীবনে একটা মস্ত দিক থেকে আমি বঞ্চিত রয়ে গেলাম।

সুরজিতের কথায় আর স্বরে কি ছিল কে জানে, দু হাতে মুখ ঢেকে কেঁদে ফেললো অনিতা।

তার নীরব কান্না মন দিয়ে অনুভব করলো সুরজিৎ। স্তব্ধভাবে সিগরেটে টানের পর টান দিয়ে চললো সে।

একটু শান্ত হোয়ে চোখ মুছে উঠে দাঁড়ালো অনিতা। ধীর পায়ে এগিয়ে যেতে যাবে, বাধা দিলো সুরজিৎ।

—এদিকে এসে এখানে বোসো। খাটে তার পাশটা দেখিয়ে দিলো। —আমার কথা শেষ হয়নি অনিতা।

অনিতা বসলো।

সুরজিৎ বলে চললো, —কেন আজ তোমাকে নিজের কথাটা এ ভাবে বললাম বা, তোমার সম্পর্কে যা বুঝেছিলাম সেটা সত্যি কিনা জানতে চাইলাম, জানো?

মুখ তুলে তাকালো অনিতা।

—কারণ, বেশ কিছুদিন থেকে আমার মনের ওপর এই কথাগুলো বড় বেশী করে চেপে বসতে চাইছে। জেনে ও জানিয়ে একটু হাল্কা হওয়া, এর বেশী আর কোনো প্রত্যাশা আমার নেই। ধীরে হাতটা আড়াআড়ি করে রাখলো সে চোখের ওপর। তারপর অনেকটা আপন মনেই বলে চললো, —নইলে কে জানে হয়তো এরই চাপে আবার তারা বুকে বাসা বাঁধবে, কুরে কুরে খেয়ে ঝাঁঝরা করে দেবে বুকের ভেতরটা—

—না না না, আর্তনাদ করে উঠলো অনিতা। আর সঙ্গে সঙ্গেই নিজের ঘরের দিকে নজর পড়তেই চম্‌কে উঠলো সে।

অন্ধকার ঘরে আবছা চাঁদের আলোয় দেখা গেলো ইজিচেয়ারে সাদা ট্রাউজার পরা একটা পা আর একটা পায়ের ওপর তোলা। হাতের সিগরেটটা ঘন ঘন জ্বলে উঠছে দপ্ দপ্ করে।

ধীরে উঠে দাঁড়ালো অনিতা, —আলোটা জ্বালি?

—জ্বালো। শুয়ে পড়লো সুরজিৎ।

আলো জ্বেলে, মশারী ফেলে আবার আলো নিভিয়ে দিয়ে আস্তে দরজাটা টেনে নিয়ে নিজের ঘরে এসে দাঁড়ালা অনিতা। জ্বাললো আলো। ক্লান্ত দুটি চোখ তুলে তাকালো সুকুমারের দিকে।

চোখ বুজে স্তব্ধ পাথরের মতো বসে আছে সুকুমার।

অনিতা গেলো স্নানের ঘরে। চোখ মুখ ধুয়ে মুছে এসে দাঁড়ালো ইজিচেয়ারের পাশে। মৃদুকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো, —কখন এলে?

তার কথার কোনো উত্তর না দিয়ে নীরবে উঠে দাঁড়ালো সুকুমার। কাপড় বদলে স্নান সেরে এলো। অনিতা কিছু বলতে চাইছে বুঝেও তাকে কোনো সুযোগ দিলো না। সোজা গিয়ে ঢুকলো খাবার ঘরে।

অনিতা বাধ্য হল তাকে অনুসরণ করতে।

অনিতা কিছুই খেতে পারলো না, লক্ষ্য করলো সুকুমার, কিন্তু বললো না একটি কথাও।

ঘরে এসে সুকুমার গিয়ে শুয়ে পড়লো একপাশ ফিরে।

খাটে এসে বসলো অনিতা, —তুমি কিছু জানতে চাইবে না, কিছু জিজ্ঞেস করবে না?

—কিছু বলবার থাকলে বলো, শুনছি। প্রাণহীন শুক্‌নো গলা সুকুমারের।

গড় গড় করে বলে গেলো অনিতা সন্ধ্যার পুরো ঘটনা, একটি শব্দ বাদ না রেখে।

খাটের ওপর উঠে বসলো সুকুমার। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে বসে থেকে কি একটু মনে করে নিয়ে নিজের মনেই যেন বললো, —ও তাই বিয়ের রাত্রে জিজ্ঞেস করেছিলে আমি নিজে তোমাকে দেখতে যাই নি কেন?

আর্ত চাপা কণ্ঠে অনিতা বলে উঠলো, —কিন্তু সত্যিই কি আমি অপরাধ কিছু করেছি? বলো বলো, তুমি বলো—কেন এমন হল?

খাট থেকে নেমে একটা সিগরেট ধরিয়ে জানলার ধারে গিয়ে দাঁড়ালো সুকুমার। সে-ও তখন এই কথাটাই ভাবছে, কেন এমন হয়!

গত দশকে ভারতবর্ষের আর্থিক বৃদ্ধি ও বণ্টন

প্রণবকুমার বর্ধন

আর্থিক উন্নতিকল্পে সরকারী যোজনার এক দশক অতিক্রান্ত হয়েছে। একথা প্রায়ই শুনতে পাওয়া যায় যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ এক নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে অগ্রগতির প্রচেষ্টায় ব্রতী হয়েছে। এই দেশের গতি-প্রকৃতি বিশ্বের গণতান্ত্রিক প্রগতিশীলতার কষ্টিপাথর ব'লে বিবেচিত হয়েছে। এমন দুরূহ নৈতিক ভার যখন আমাদের স্কন্ধে, আমাদের প্রতি পদক্ষেপ যখন পৃথিবীশুদ্ধ লোকের উন্মুখ দৃষ্টির বিষয়বস্তু, তখন গত দশবছরে আমাদের অভিজ্ঞতার খতিয়ান জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় দিক দিয়েই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

জগৎসভায় আমরা প্রায়শই শতবীণাবেণুরবে প্রচার করে থাকি যে একই সঙ্গে দ্রুত আর্থিক উন্নয়ন এবং সমাজবাদী গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় আমরা প্রয়াসী এবং অদূর ভবিষ্যতে যুগপৎ এই দুঃখ ও তাম্রকূট সেবনের পরাকাষ্ঠা আমরা প্রদর্শন করব। এদিক দিয়ে গত দশকের অভিজ্ঞতা কিন্তু মোটেই আশাপ্রদ নয়। প্রথমেই ধরা যাক আমাদের আর্থিক বৃদ্ধির মাত্রার কথা। ১৯৫১ সাল থেকে ১৯৬১ পর্যন্ত আমাদের জাতীয় আয় বৃদ্ধি পেয়েছে ৪২ শতাংশ। প্রতিবেশী চীনের জাতীয় আয় ১৯৫৩-৫৭এর মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছে ৫৩ শতাংশ এবং তার পরের দুই বছরেই (১৯৫৮-৫৯) বৃদ্ধি হয়েছে ৬৩ শতাংশ। গত দশ বছরে পশ্চিম ইউরোপের অধিকাংশ দেশ, সোভিয়েট রাশিয়া এবং জাপানের সঙ্গে আমাদের আর্থিক অবস্থার ব্যবধান হ্রাস পাওয়া দূরে থাকুক, বৃদ্ধি পেয়েছে। এদিকে আমাদের লোকসংখ্যা শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বেড়েছে ২১ শতাংশ। ফলে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র ১৬ শতাংশ। হিসেব ক'রে দেখা যায় যে এই ভারতবর্ষেই উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে অন্তত দুটি দশকে মাথাপিছু আয় প্রায় ঐ একই হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল।

আর্থিক বৃদ্ধির মাত্রার কথা ছেড়ে দিলেও গত দশকে আমাদের ধনবণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে চিন্তিত হবার যথেষ্ট অবকাশ আছে। দরিদ্র জনসাধারণের মধ্যে আজ এই অভিযোগ সুস্পষ্ট যে দশবছরের পরিকল্পিত উন্নয়নের পরেও তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই রয়ে গেছে। তারা সন্দেহ করে যে শব্দকগতিতে হ'লেও যেটুকু আর্থিক বৃদ্ধি আমাদের হয়েছে তার একটা মোটা অংশ গেছে মুষ্টিমেয় রজতকুলীনের কাছে। নির্বাচনী বৎসরে এইসব প্রশ্ন তোলায় অসুবিধা হচ্ছে যে এতে অনেকেই ভ্রূকুঞ্চিত করবেন বা সোজাসুজি এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করবেন। জনশ্রুতি আছে যে সরকার জনসাধারণের চাপে এই সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিটি বসিয়েছেন। কিন্তু তারপরেও এক বৎসরের অধিককাল অতিক্রান্ত হয়েছে, এই কমিটি এখনও আদৌ জীবিত আছে কিনা, বা জীবিত থাকলে জীবনের কি কি লক্ষণ প্রকাশ করছে, কার্যকলাপ কতদূর অগ্রসর হয়েছে এ সম্বন্ধে জনসাধারণ ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেনি। বলাবাহুল্য, আগামী নির্বাচনী সমরের পূর্বে এর ফলাফল প্রকাশিত হবে না।

ভারতবর্ষের ধনবণ্টন ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করার অসুবিধা আছে অনেক। মাল-

মশলা এতই কম এবং বহুধাবিক্ষিপ্ত যে কোন নিখুঁত এবং সার্বিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া প্রায় অসম্ভব। তবুও বিভিন্ন স্থান থেকে কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ ক'রে তার ভিত্তিতে এমন কয়েকটি অনুমান ও প্রকল্প তৈরী করা যায় যা' থেকে গত দশ বৎসরে ভারতীয় ধনবণ্টনব্যবস্থার গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যেতে পারে।

প্রথমেই দেখা যাক আয়করের পরিসংখ্যান থেকে আয়বণ্টন সম্বন্ধে কিছু জানা যায় কিনা। ভারতবর্ষের গ্রামগুলি বাদ দিলে অন্যত্র যাঁরা ব্যক্তিগত আয়কর দিয়ে থাকেন, জাতীয় আয়ে তাদের অংশ ১৯৫১ সালে ছিল শতকরা ৪.৮, ১৯৫৯-৬০ সালে দাঁড়িয়েছে ৫.৮, যদিও ইতিমধ্যে আয়ের যে অংশ তাঁরা কর হিসাবে দিয়ে থাকেন তা' শতকরা ১৭ থেকে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ১৩ তে। হিসেব করলে আরও দেখা যায়, সবচেয়ে বেশী লাভ হয়েছে যাঁদের আয় দশ হাজার থেকে প'চিশ হাজার টাকার মধ্যে পড়ে, অর্থাৎ যাঁরা 'উচ্চ মধ্যবিত্ত' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

ভারতবর্ষের মত কল্যাণরাষ্ট্রে ধনবণ্টনব্যবস্থার বৈষম্য দূরীকরণে করনীতির গুরুত্ব খুবই বেশী। অথচ এদিক দিয়ে আমাদের করব্যবস্থা একেবারেই কার্যকরী হয়নি। গত দশকের মাঝামাঝি আমরা অনেকগুলি নতুন প্রত্যক্ষ কর বসিয়ে বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের প্রশাসনিক দক্ষতার দৌলতে সমস্ত ব্যাপারটাই হাস্যকর অকিঞ্চিৎকরতায় পর্যবসিত হয়েছে। যে দেশে সম্পত্তি থেকে মোট বাৎসরিক আয় জাতীয় আয়ের এক চতুর্থাংশেরও বেশী, ১৯৬০-৬১ সালে সে দেশে সম্পত্তিকর থেকে জাতীয় আয়ের ০.০৫ শতাংশ মাত্র পাওয়া গেছে। ব্যয়কর, সম্পত্তিকর, মৃত্যুকর এবং দানকরের মিলিত রাজস্ব জাতীয় আয়ের ০.০৮ শতাংশ মাত্র।

বৈষম্য দূরীকরণে পরোক্ষ করের চেয়ে প্রত্যক্ষ করের উপযোগিতা সর্বজনস্বীকৃত। কিন্তু গত দশ বছরে মোট রাজস্বের যে অংশ আমরা আয় এবং সম্পত্তির উপর প্রত্যক্ষ কর থেকে পাই, তা' ৩৩ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ৩০ শতাংশে, আর জিনিষপত্র ইত্যাদির উপর পরোক্ষকরের অংশ শতকরা ৫৯ থেকে বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৬৩ তে। পরোক্ষকরের এই মাত্রাবৃদ্ধির ভার কোন শ্রেণীকে বহন করতে হয় তার পরিচয় পাওয়া যাবে একটা উদাহরণ দিলেই। কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্কের যে অংশ কেরোসিন, দেশলাই, চিনি, চা, সাবান, কার্পাসবস্ত্র ইত্যাদি নিত্যব্যবহার্য সামগ্রীর উপর চাপান হয়েছে তা' ১৯৫০-৫১ সালে ছিল শতকরা ৪৩ ভাগ, ১৯৫৯-৬০-এ তা' বেড়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৫০ ভাগে। অন্যদিকে মোটর গাড়ী, পশমীবস্ত্র, নকল সিল্কজাতদ্রব্য, ইলেকট্রিক পাখা, মোটর স্পিরিট ইত্যাদি বিলাসসামগ্রী বা ধনিব্যবহৃত দ্রব্যের উপর শুল্কের অংশ ৪৮ শতাংশ থেকে কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৬ শতাংশে।

আয়করের পরিসংখ্যান থেকে কৃষিজাত আয় সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। ভূমিস্বত্ব সম্পর্কীয় জাতীয় স্যাম্‌পল সার্ভের উপর ভিত্তি ক'রে একটা খসড়া হিসেব ক'রে দেখা গেছে যে ১৯৫৩-৫৪ সালে আমাদের দেশের কৃষিনির্ভর জনসংখ্যার শতকরা দশভাগ মোট কৃষিজ আয়ের অর্ধেক উপভোগ ক'রেছে (এদের মাথাপিছু আয় বছরে ৮৫৮ টাকা), আর বাকী শতকরা নব্বই ভাগের বরাতে মাথাপিছু আয় বছরে ১১২ টাকা। জাতীয় আয়ের পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৫৯-৬০ এর মধ্যে কৃষিজ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে মোট ১৩০০ কোটি টাকা। খসড়া হিসেব থেকে দেখা যায় যে এই বৃদ্ধির শতকরা ৩০ ভাগেরও বেশী গেছে ধনী কৃষকসম্প্রদায়ের হাতে, ৩০ একরেরও বেশী জমির উপর

যাদের মালিকানা এবং যারা মোট গ্রামীণ লোকসংখ্যার ৩ শতাংশ মাত্র। এই ধনী কৃষকেরা রাজ্যসরকারকে যে কৃষি আয়কর দেয় তা' নামমাত্র এবং এদের মূলধনের স্ফীতি আমাদের সরকারের কর ব্যবস্থার কবল থেকে বলতে গেলে সম্পূর্ণই নিষ্কৃতি পেয়েছে।

ভারতীয় শ্রমিকের আর্থিক অবস্থাটা এবার একটু যাচাই ক'রে দেখা যাক। প্রথমেই নেওয়া যাক কৃষিশ্রমিকদের কথা, যারা মোট গ্রামীণ লোকসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ এবং সামাজিক ও আর্থিক উভয় দিক দিয়েই যারা ভারতবর্ষের সবচেয়ে অনুন্নত শ্রেণীগুলির অন্যতম। ১৯৫৬-৫৭ সালে দেখা গেছে এদের মাথাপিছু আয় বছরে ১০০ টাকারও কম। দ্বিতীয় কৃষিশ্রমিক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে যখন কৃষিজ আয় বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ১৩ ভাগ, কৃষিশ্রমিক পরিবারগুলির মোট আয় শতকরা ১১ ভাগ কমে গেছে, পরিবারে উপার্জনকারীর সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ বৃদ্ধি পাওয়া সত্ত্বেও পরিবার পিছু বাৎসরিক আয় শতকরা ২.২ ভাগ কমে গেছে। পরিসংখ্যান পদ্ধতির কিছু কিছু ত্রুটির জন্য ঐ কমিটির অনুসন্ধানের ফলাফলের নির্ভরযোগ্যতা সম্বন্ধে অনেকে সন্দিহান। কিন্তু একথা প্রায় সবাই স্বীকার করেছেন যে গত দশকে আমাদের দেশে কৃষিশ্রমিক সম্প্রদায়ের আপেক্ষিক আর্থিক অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে শিল্পশ্রমিকের অংশ প্রায় একই রয়েছে। সেন্সাস অফ ম্যানুফ্যাকচারিং-এ যে ২৯টি শিল্পকে গণনা করা হয় তাদের আয়ে শ্রমিকের অংশ ১৯৪৮-৫০ সালে ছিল শতকরা ৪৯ ভাগ, ১৯৫৬-৫৮ সালে তা' কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছে শতকরা ৪৩.৫ ভাগ। উৎপাদন বৃদ্ধির মান যদি ১৯৫৩ সালে ১০০ ধরা হয়, তবে ১৯৫৮ সালে তা' গিয়ে দাঁড়িয়েছে ১৩২.৭ এ, কিন্তু শ্রমিকের আয়ের মান ১৯৫৮ সালে দাঁড়ায় ১০২.৬ এ। শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির একটা বৃহৎ অংশ থেকেই শ্রমিকেরা বঞ্চিত হয়েছে। অন্যদিকে মুনাফার মান ১৯৫০ এ ১০০ ধরলে ১৯৫৮ সালে হয়েছে ১৫২।

গত দশকে ভারতীয় শ্রমিকের আর্থিক অবস্থা বিচার করতে গেলে আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে হয় তা' হচ্ছে বেকার ও অর্ধবেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে দেশে পূর্ণবেকারের সংখ্যা ছিল পঞ্চাশ লক্ষ, পরিকল্পনার শেষে বেকারদের পল্টনে যোগ দিয়েছে আরও চল্লিশ লক্ষ। এ ছাড়া বর্তমানে অর্ধবেকারের সংখ্যাও দেড় কোটির ঊর্ধ্বে। ভারতবর্ষের বেকার সমস্যার প্রকৃতি সত্যিই ভয়াবহ।

বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভোগ্যপণ্যের উপর ব্যয়ের মাত্রা দেখেও দেশের আয়বণ্টন সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। ভোগ্যপণ্যের উপর গার্হস্থ্য ব্যয়ের যে হিসেব জাতীয় স্যাম্পল সার্ভে থেকে পাওয়া যায়, তাতে জানা যায় যে, ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে মোট জনসংখ্যার নিম্নতর তিন-চতুর্থাংশের ব্যয় প্রায় একই রয়েছে, কিন্তু ঊর্ধ্বতন এক-দশমাংশের বয়ের মাত্রা মোট ব্যয়ের ২৫ শতাংশ থেকে ২৮ শতাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভোগবৈষম্য এবং জীবনযাত্রার মানের পার্থক্য নগর অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী। ১৯৫২-৫৩ সাল থেকে ১৯৫৬-৫৭ সালের মধ্যে মোট নাগরিক জনসংখ্যার নিম্নতর তিন-চতুর্থাংশের ব্যয় মোট নাগরিক ব্যয়ের ৪৯ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৪৬ শতাংশে, আর ঊর্ধ্বতন এক-দশমাংশের ব্যয়ের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে শতকরা ৩০.৮ ভাগ থেকে ৩৩.১ ভাগে। ক্রমাগত

মুদ্রাস্ফীতি, মুনাফাবাহী বাণিজ্য ও ফাটকাবাজী, কঠোর সরকারী আমদানীনীতির কল্যাণে নিরাপদ আভ্যন্তরীণ বাজার, একচেটিয়া প্রভাব—ইত্যাদি নানা কারণে গত দশকে নাগরিক ব্যবসায়ী এবং শিল্পপতিদের পৌষমাস গেছে। স্ফীত আয়ের বড় অংশটাই শতরন্ধ্র সরকারী করব্যবস্থাকে নিপুণভাবে ফাঁকি দিয়ে গেছে।

এইভাবে বিভিন্ন জায়গা থেকে তথ্য সংগ্রহ করলে দেখা যাবে যে গত দশ বৎসরে ধনবৈষম্যবৃদ্ধি সম্পর্কে সাধারণের মনে যে একটা সন্দেহ রয়েছে তা একেবারেই ভিত্তিহীন নয়। অথচ সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে সমাজ গড়বার যে মহান্ আদর্শ আমরা গ্রহণ করেছি সে সম্বন্ধে এখনও আমরা—বিশেষ ক'রে এই নির্বাচনী বছরে—যথারীতি মুখর। অনেকে বলেন যে আর্থিক উন্নতির প্রথম দিকে ধনবৈষম্যবৃদ্ধি প্রায় অপরিহার্য। সমর্থনের জন্য তাঁরা পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার ইতিহাস থেকে বিভিন্ন দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন। কিন্তু এইসব দেশে আর্থিক উন্নতি এসেছিল মোটামুটি বেসরকারী প্রচেষ্টায়। এক্ষেত্রে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তির দোহাই দেওয়ার অর্থ সরকারী পরিকল্পনা প্রচেষ্টার ব্যর্থতা মেনে নেওয়া। আবার অনেকে বলেন যে ধনবৈষম্যনিরসনের চেষ্টা আর্থিক বৃদ্ধির পরিপন্থী, কেননা এতে ব্যক্তিগত কর্মীর উৎসাহ কমে আসে এবং দেশের মোট সঞ্চয়ও কম হয়। কিন্তু যে দেশে জনসাধারণের বৃহৎ অংশ অসহ্য দারিদ্র্যের ভারে ক্লিষ্ট অথচ মুষ্টিমেয় ধনিসম্প্রদায়ের আয় এবং জীবনযাত্রার মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়, সে দেশে জাতীয় প্রগতির জন্য কতটুকু উৎসাহ বাকী থাকে? আমাদের দেশে জনসাধারণ পরিকল্পনার কাজে যথেষ্ট অন্তরঙ্গভাবে অংশ গ্রহণ করছে না এই মর্মে যে অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় তাতে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। আর সঞ্চয়ের দিকটা বিচার করলে দেখা যাবে যে ১৯৫০-৫১ সাল থেকে ১৯৫৮-৫৯ সালের মধ্যে আমাদের জাতীয় সঞ্চয়ের হার জাতীয় আয়ের ৬.৭ শতাংশ থেকে মাত্র ৭.৭ শতাংশ হয়েছে; অথচ গত দশকের ধনবৈষম্যবৃদ্ধির জন্য আমাদের সঞ্চয়ের হার আরও বৃদ্ধি পাওয়া উচিত ছিল। আসলে আজকের দিনের ধনিসম্প্রদায় উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপের ধনিসম্প্রদায়ের মত পিউরিটানস্বভাবাপন্ন সঞ্চয়শীল নন। তাই ধনবৈষম্যবৃদ্ধির ফলে জাতীয় সঞ্চয়বৃদ্ধির বিশেষ আশা নেই। প্রকৃতপক্ষে আর্থিক উন্নতির জন্য ধনবৈষম্যবৃদ্ধির পক্ষে অর্থনৈতিক যুক্তিগুলি নিতান্তই দুর্বল। সমস্যাটা আসলে রাজনৈতিক। রাজনৈতিক স্তরে এর সমাধানের প্রচেষ্টায় যত্নবান না হ'লে ভবিষ্যতে আমাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হবে।

শ্বাপদ

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

আমার পড়ার ঘরে ঢুকে সে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি একবার মাত্র বই থেকে মুখ তুলে আগন্তুকের চেহারাটা দেখে নিলাম। যেন ঐ একবার তাকানোই যথেষ্ট। তাতেই বুঝে নিলাম মানুষটি কেমন। বলতে কি, প্রথম দর্শনেই আমার মন কেমন খারাপ হয়ে গেল; এই মানুষ আমার সঙ্গে থাকবে, এখানে খাবে, হয়তো আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোবে চিন্তা করে মনটা ভীষণ খারাপ লাগতে লাগল।

আস্তে আস্তে সে আমার পড়ার টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। হাত বাড়িয়ে একটা বই তুলল। নামটা পড়ল। দুটো পাতা ওল্টাল। তারপর আবার বইটা রেখে দিল।

আমি তখন গভীর মনোযোগের সঙ্গে বাঁধানো খাতাটা টেনে নিয়ে ক্লাসের অঙ্কগুলি টুকে নিচ্ছিলাম। টেবিলে ছোট টাইম্‌পীসটা টিকটিক শব্দ করছিল। কিন্তু সেই মৃদু শব্দ হঠাৎ যেন অস্বস্তিকর লাগছিল। যেন আমার কাজে বাধা দিচ্ছিল। হঠাৎ মনে হল আমার খুব গরম লাগছে, কানের ভিতর দিয়ে গরম বাতাস বেরোচ্ছে। কাজ করা আর হল না। খাতাটা বন্ধ করে কলমটা হাত থেকে এক রকম ছুঁড়ে ফেলে রেখে দুপদাপ করে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

একটা লোকের উপস্থিতি যে কত খারাপ লাগতে পারে বাইরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে লাগলাম। অথচ সে আমার কোন অপকার করছিল না, কোনরকম অনিষ্ট-চিন্তা করছিল না। কিন্তু তবু কেন তার ওপর আমার এই বীতস্পৃহা রাগ আক্রোশ প্রথম দিন থেকে বুকের ভিতর দানা বাঁধতে সুরু করল ভেবে পাই নি। হয়তো তাই হয়। রাস্তায় একটা লোক হেঁটে যাচ্ছে—নাম ধাম জানি না স্বভাবচরিত্র কেমন শুনিনি, অথচ লোকটাকে একটুখানি দেখেই কেমন ভাল লেগে গেল, বাসে উঠলাম, আর একটা মানুষ সদয় হয়ে এক পাশে সরে বসে আমাকে বসতে একটু জায়গা করে দিল, কিন্তু কেন জানি মানুষটাকে দেখেই আমার এত খারাপ লাগল যে মুখ ঘুরিয়ে রড্ ধরে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলাম; সাধারণ একটা ধন্যবাদ জানাবার মতন আমার মনে উদারতা জাগবে দূরে থাক—তার পাশে বসতে হবে চিন্তা করে দেহমন কুঞ্চিত হয়ে উঠল। অথচ চেহারায় পোষাকে তাকে ঘৃণা করার কিছু নেই। তবু তার ওপর আমার বিরক্তি বিদ্বেষ ঘৃণা। কাজেই মানুষকে অপছন্দ করার ঘৃণা করার কারণ যেমন চট করে হাতের কাছে খুঁজে পাওয়া যায় না, তেমনি ভাল লাগার যুক্তিও যে সর্বদা উপস্থিত থাকবে বলা শক্ত। যুক্তির চেয়ে চোখের দেখাটাই আগে মনের ওপর কাজ করে। যেমন সেদিন আমার পড়ার ঘরে মানুষটাকে দেখামাত্র তার ওপর আমার মন বিরূপ হয়ে উঠেছিল।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাগানের ডালিম গাছটা দেখছি, পড়ার ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সে আমার পাশে দাঁড়াল। বুঝলাম আমার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। কিন্তু অত চট্ করে আলাপ জমাবার সুযোগ তাকে কে দেয়! আমি গম্ভীর হয়ে নীচে নেমে গেলাম। ঘাসের ওপর পায়চারী করতে লাগলাম। যা আশঙ্কা করলাম, সে নীচে নামল। রাগে দুঃখে আমি সেখান থেকে একরকম ছুটতে ছুটতে বাইরে রাস্তায় চলে গেলাম। আমাকে

এভাবে ছুটতে দেখে সে অবাক হয়েছিল, টের পেয়েও আমি দূরে সরে গেলাম, তার নাগালের বাইরে; তার ছায়া আমার ছায়ার সঙ্গে মিশতে দেব না এমন একটা কঠিন প্রতিজ্ঞায় আমার দু পাটির দাঁত কঠিন দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

সকালটা এভাবে কাটল। রাস্তায়, কখনো বাগানে। বাড়ির ভিতর ঢুকতে ইচ্ছা করছিল না। স্কুলে অঙ্কের মাষ্টারের বিস্তর বকুনি খেলাম হোম-টাস্ক করা হয়নি বলে। মুখ ফুটে কিছু বললাম না। হয়তো আমি যদি সুকুমারবাবুকে বুঝিয়ে বলতাম কি কারণে অঙ্কগুলি করে আনা হয়নি তো তিনি নিশ্চয় আমাকে গালমন্দ না করে চুপ করে যেতেন, একটু সহানুভূতি দেখাতেন।

কিন্তু কি করে বলি, বাড়িতে একটি লোক এসেছে, আমার এক মাসতুত ভাই—যাকে দেখে আমার মেজাজ বিগড়ে গেছে। পড়ার টেবিলের কাছে ঘেঁসেছিল যখন তার গায়ের বোটকা গন্ধ ঘামের গন্ধ আমার নাকে লেগেছিল; শুকনো পেঁয়াজের শিকড়ের মত চার পাঁচটা অসমান দাড়ি থুতনি ফুঁড়ে বেরিয়ে আছে, মাথার চুলগুলি খাড়া খাড়া, নখগুলি বড় বড়; রং চটা ছোট একটা হাফ-প্যাণ্ট পরনে—যা তার বয়স ও দেহের কাঠামোর পক্ষে অত্যন্ত বেমানান ঠেকছিল; মুগুরের মাথার মতন জবরদস্ত হাঁটু দুটোর দিকে তাকিয়ে কথাটা আমার মনে হয়েছিল। এমন একটা অপরিচ্ছন্ন বুনো চেহারার মানুষ আমার মাসতুত ভাই—আর সে আমাদের বাড়িতে থাকবে খাবে শোবে, হয়তো আমার ঘরে আমার বিছানায় আমার পাশে শোবে চিন্তা করে সারা সকাল আমার মাথা গরম ছিল, অঙ্কের স্যার সুকুমারবাবুকে যদি বুঝিয়ে বলতে পারতাম! না, কাউকে বলা হল না। ক্লাসে চুপচাপ মুখভার করে বসে আমার সারাদিন কাটল। সহপাঠীদের গল্পে যোগ দিতে পারিনি। লীগের খেলা, সিনেমা, রকেট, গ্যাগারিন, ইংলিশ চ্যানেল—কত কি গল্প বুম্বুদের মতন আমার নাকের সামনে চোখের সামনে ভেসে বেড়াল ঘুরে বেড়াল—আমি একটা বুম্বুদ ওড়াতে পারিনি, একটাও ফুঁ দিয়ে ভাঙগতে পারিনি। কেবল বোকার মতন হাঁ করে তাকিয়ে থেকে সব দেখলাম, শুনলাম। মনে হচ্ছিল আমি অপাংক্তেয় হয়ে গেছি, পরিচিত বন্ধুদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। তাদের সঙ্গে কথা বলবার মিশবার অধিকার আমার নেই। কেমন কান্না পাচ্ছিল। দূরে বা কাছে এমন একটি মাসতুত ভাই আমার থাকতে পারে কোনদিন চিন্তা করিনি। ওরা—সহপাঠী বন্ধুরা আমার ওই ভাইটিকে দেখলে নির্ঘাৎ হেসে ফেলবে নাক সিঁটকাবে। আমার এমন জংলী চেহারার এক ভাই আছে যখন তারা জানতে পারবে তাদের কাছে আমিও অস্পৃশ্য হয়ে যাব।

স্কুল ছুটির পর বাড়ি ফিরতে ইচ্ছা করছিল না।

নিশ্চয় পথের দিকে হাঁ করে সে তাকিয়ে আছে। আমার জন্য অপেক্ষা। আমার সঙ্গে কথা বলতে মিশতে মানুষটা কী ভীষণ ছটফট করছিল তখন বোঝা গেছে। সকাল বেলা বলা কওয়া নেই একটা ফাইবারের সুটকেশ হাতে ঝুলিয়ে হাঁটু অবধি ধুলো নিয়ে সে যখন বাড়িতে ঢুকল আমি তা দেখে অবাক। ঢিপ করে মাকে প্রণাম করল বাবাকে প্রণাম করল। মা আমার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'চিনতে পারিস? ছোটবেলায় দেখেছিস—তারপর তো আর দেখা হয়নি, তোর মাসতুত ভাই—গণেশ। সোদপুরের মাসিমার ছেলে।' সোদপুরে আমার এক মাসিমা ছিল জানতাম, ক বছর আগে তিনি মারা গেছেন তা-ও শুনেছি—হাঁপানির রোগী মেসোর কষ্টেসৃষ্টে সংসার চলে—রোগের জন্য তেমন ভাল কাজকর্ম জোটাতে পারছেন না, তার ওপর একটা বড় মেয়ে আছে ঘাড়ে, একটা

ছেলে আছে। মাঝে মাঝে বাবা ও মাকে সেই মেসোর কথা বলাবলি করতে শুনতাম। বোন নেই, কিন্তু তা হলেও মা সেই রুগ্ন মেসো ও তাঁর ছেলে মেয়েকে দেখতে একদিন সোদপুরে গিয়েছিল—তা-ও প্রায় বছর ঘুরতে চলল। এখন সেই সোদপুরের মাসির ছেলে যে এই ছেলে—এই চেহারা আমি কি করে জানব। মাথার খাড়া খাড়া চুল ও থুতনির আগায় পেঁয়াজের শিকড় কটা দেখে আমার প্রথমটায় এমন হাসি পাচ্ছিল। তালগাছের মতন ঢ্যাঙ্গা শরীর। আর মনে হচ্ছিল লোকটা কালা বোবা হবে। মা তাকে কী প্রশ্ন করছে হয়তো শুনতে পাচ্ছে না; বাবা কী জিজ্ঞেস করছেন বুঝতে পারছে না। কেমন যেন অসহায় শূন্য দৃষ্টি তুলে ধরে বাবাকে দেখছিল মাকে দেখছিল এবং ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে বার বার আমাকে দেখছিল। ঠিক কালা বোবা না হলেও, বোকা মূর্খ আস্ত একটি গর্দভ হবে ওই তালগাছের মতন মানুষটা চিন্তা করে আমি আমার পড়ার ঘরে চলে এলাম। তারপর বুঝি সেই মানুষ মার কথামতন জামাকাপড় ছেড়েছে, মুখ হাত ধুয়েছে, হাঁটুর ধুলো পরিষ্কার করেছে এবং মার দেওয়া চা রুটি যা হোক কিছু খেয়ে আস্তে আস্তে একসময় আমার পড়ার ঘরে এসে ঢুকেছিল। পড়ার ঘর মানে আমার থাকবার শোবার বসবার পায়চারী করবার এবং অনেক কিছু করবার ঘর। আমার সংসার, আমার পনেরো বছরের জীবনের একমাত্র আশ্রয়স্থল চার ফুট ছ ফুট ওই কুঠুরিটা। মুনি-ঋষিদের যেমন গুহাগহ্বর থাকে এবং সেটাই তাদের একমাত্র জগৎ আমার পড়ার ঘরটাও আমার সেই গোপন সুরক্ষিত পবিত্র নির্জন জগৎ। সেখানে হঠাৎ এমন বিশ্বঘুটে চেহারার একটা মানুষকে ঢুকে পড়তে দেখে কি রাগটাই না আমার তখন হয়েছিল।

কিন্তু এখন স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে আমার নানারকম দুর্ভাবনা হচ্ছিল। যদি দুপুরে আবার সে আমার পড়ার ঘরে ঢুকে থাকে! বইগুলি ঘাঁটতে পারে, টেবিলের টানাটা খুলে দেখতে পারে; আমার বিছানার বালিশের তলায় কী আছে না আছে শূন্য ঘরে সব নেড়েচেড়ে উল্টেপাল্টে পরীক্ষা করতে তাকে বাধা দেবে কে। বাবা অফিসে, মা নিজের ঘরে পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, চাকরটা এসময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে তাস পিটতে নিজের আড্ডায় চলে যায়, সুতরাং—

নিশ্চয় বইগুলি ঘাঁটতে ঘাঁটতে কোনো না কোনো একটার পাতার খাঁজের ভিতর লুকিয়ে রাখা দু তিনটা চিঠি ও একটা ফটো তার চোখে পড়বে, টানাটা খুললে প্ল্যাস্টিকের ছোট্ট সেফ্‌টি রেজারটা দেখে ফেলবে; মা কোনোদিন আমার বই বা টেবিলের টানা ঘাঁটা-ঘুটি করে না, বাবাকে তো এজীবনে আমার পড়ার ঘরে উঁকি দিতেই দেখিনি, কাজেই নিশ্চিন্ত হয়ে আমি সবকিছু টেবিলের টানার ভিতর বইয়ের খাঁজের মধ্যে রেখে দিতে পারতাম। বালিশের নীচে আজ ভুল করে সিগারেটের প্যাকেটটা রেখে এসেছি। পারত পক্ষে মা আমার বিছানা ধরে না, দরকার হলে চাকরটাকে পাঠিয়ে দেয়, চাদরটা ওয়ারটা খুলে আমি তার হাতে তুলে দিই সাবান দিয়ে কেচে দিতে কি ডাইংক্লিনিং-এ পাঠাতে। কিন্তু তা হলেও সিগারেটটা দেশলাইটা আমি বালিশের নীচে কি তোষকের নীচে রাখি না। আজ কেমন ভুল হয়ে গেল। আর ঠিক আজই সেই লোক আমার ঘরে ঢুকবে। না, ওই গেঁয়োটাকে আমি ভয় করি না। কোথায় সোদপুরের ছেলে আর আমি খাস বালিগঞ্জের ছেলে। এই বয়সে আমি সিগারেট খাচ্ছি কি দাঁড়ি গোঁফ কামাচ্ছি কি কিছু গোপন চিঠিপত্র ও আমার প্রিয় দু একজন ফিল্ম স্টারের ছবি বইয়ের ভিতর লুকিয়ে রেখেছি তা আমি দেখব। এসবের জন্য ওই কিম্ভুতকিমাকার চেহারার গণেশচন্দ্রের কাছে জবাব-

দিহী দিতে বড় একটা গ্রাহ্য করব কিনা। না, আমার ভয়, যদি মাকে বলে দেয়! চিঠির জন্য ভয় করি না। কেননা যে চিঠি লিখেছে সে আমার 'খোকন' নামের পরিবর্তে বুদ্ধি করে 'মণি' নামটা ব্যবহার করেছে। কাজেই এই চিঠি আমার কাছে লেখা নয়, এক বন্ধুর চিঠি, বন্ধু আমার কাছে রাখতে দিয়েছে মাকে স্রেফ বুঝিয়ে বলা যাবে। সেফটি রেজারের জন্যও ভয় করি না। আমার নাকের নীচে ও থুতনিতে কানে চুল গজাচ্ছে—ঘামলে মুখ কুটকুট করে, অসুবিধা হয়—তাই সেগুলি পরিষ্কার করতে অস্তাটা হাতের কাছে রাখতে হয়। মাকে বুঝিয়ে বলব, তুমি তোমার বোনপোর মুখখানা একবার দ্যাখ, তার থুতনির ওই জংগল দেখতে যদি তোমার ভাল লাগে তবে এখন থেকে আমিও না হয় আমার মুখটা এমন নোংরা করে রাখব। কিন্তু আমরা যে-জায়গায় আছি যে-পরিবেশের মধ্যে বড় হয়েছি তাতে কোনোরকম নোংরামি অপরিচ্ছন্নতা বরদাস্ত করতে শিখিনি, তুমি তা' ভাল করে জান মা। স্কুলে যাবার সময় জুতোটা চকচকে না থাকলে কি মাথার চুল পরিপাটি করে আঁচড়ান না থাকলে তুমি রাগ কর চোখ রাঙ্গাও। কাজেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে এতটুকু ত্রুটি থেকে না যায় সেদিকে ছোটবেলা থেকে আমার কড়া নজর—তোমার কাছ থেকে এই নজর পাওয়া, বাবার কাছ থেকে পাওয়া। নিশ্চয় বাবা টের পেয়েছেন আমি এখন থেকেই রেড দিয়ে মুখ চাঁছতে আরম্ভ করেছি। সেদিন খাবার টেবিলে বসে বাবা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসছিলেন। অভিজ্ঞ মানুষ। তাঁর টের না পাওয়ার কিছু কথা নয়। তার ওপর পুরুষ মানুষ। মা রেজার ব্লেডের কারবার করেন না। কাজেই আমার মুখ দেখে তাঁর টের পাবার কথা নয়। কিন্তু সেদিন সেই নীরব হাসির মধ্যে কি আমার এ-কাজের প্রতি সুন্দর একটা সমর্থন ছিল না। তাই তো তিনি চুপ করে গেলেন। স্কুলের সীমানা ডিঙ্গিয়ে পরে কলেজে ঢুকব আর আমি দাঁড়ি গোঁফ কামাব, তার আগে রেজার হাতে তোলা দোষের এমন কুসংস্কার বাবার নেই। কাজেই এদিক থেকে আমি নিশ্চিন্ত। ফিল্ম-স্টারের ছবি বইয়ের মধ্যে গুঁজে রাখা যদি দোষের হয় তো আমাদের বাড়ির দেওয়ালে দেওয়ালে যে ক্যালেণ্ডারগুলি ঝুলছে সেগুলি ছিঁড়ে ফেলতে হয়। অথচ বাবা সেগুলি অফিস থেকে আনতে না আনতে মা কত যত্ন করে দেওয়ালে টাঙ্গিয়ে রাখে। হ্যাঁ, ভয় ওই সিগারেটের জন্য। সিগারেট ধরেছি এই বয়সে জানতে পারলে মার বিস্তর বকুনি খেতে হবে। চাই কি বাবার কানে কথাটা উঠে যেতে পারে। ওই গেঁয়ো ভূতটাই না সরাসরি বাবার কাছে প্যাকেটটা নিয়ে হাজির করে। যেমন আহাম্মকের মতন চেহারা কাজকারবারও সেরকম হবে। বুকটা দমে গেল। কেমন বিশ্রী একটা ভয় গলার কাছে ডেলা পাকিয়ে যন্ত্রণা দিতে লাগল। বাড়িতে ঢুকতে পা দুটো সরছিল না।

কিন্তু ঈশ্বর যার সহায় হন তাকে কে কী করতে পারে!

সিঁড়ি পার হয়ে বারান্দায় উঠতে দৃশ্যটা আমার চোখে পড়ল। বাবার বসবার ঘরের সোফার ওপর হাত পা ছড়িয়ে দিয়ে সোদপুরের গণেশচন্দ্র ঘুমোচ্ছে। চমৎকার নাক ডাকছে। পা টিপে টিপে ভিতরে ঢুকলাম। হাঁ করে ঘুমোচ্ছে মানুষটা। কষ বেয়ে লালা ঝরছে। সোফার নীল বনাতের ওপর টুপ টুপ করে সেই লালা ঝরে আধুলির সাইজের একটা কালো দাগ ধরে গেছে জায়গাটায় এর মধ্যেই। যেন সেই লালার গন্ধে কোথা থেকে একটা মাছি উড়ে এসে ঘুমন্ত মানুষটার মুখের কাছে ঘুর ঘুর করছে। ঘেন্নায় আমার গা বমি বমি করতে লাগল। ঐ বয়সের কোনো মানুষের কষ বেয়ে লালা ঝরতে দেখলে কার না ঘেন্না হয়। তেমনি পা টিপে টিপে সে ঘর থেকে বেরিয়ে আমি আমার ঘরে চলে

এলাম। সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে টেবিলের বইগুলি দেখলাম। না, ঠিক আছে সব, কেউ ঘাটাঘাটি করে নি। টেবিলের টানাটা খুলে দেখলাম, যেমনটি সব রেখে গেছলাম জায়গা-মতন রয়ে গেছে, বোঝা গেল কারো হাত পড়েনি। বালিশটা তুলতে সিগারেটের প্যাকেটটা চোখে পড়ল, চট করে ওটা সেখান থেকে সরিয়ে ফেললাম। কোণায় পুরনো খবর কাগজের জঞ্জালের মধ্যে আপাততঃ ওটা গুঁজে রাখলাম। এবার আমি নিশ্চিন্ত। হাল্কা নিশ্বাস ছেড়ে জামাকাপড় ছাড়লাম। 'বোকা লোক', মনে মনে বললাম, 'একদিক থেকে ভাল। শয়তানি বুদ্ধি থাকলে আমার পড়ার ঘরে ঢুকে এটা ওটা নাড়াচাড়া করত, কোথায় কি আছে না আছে খুঁজতে আরম্ভ করত।' কিন্তু তা না করে বাইরের ঘরে সোফার ওপর পড়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে বলে সোদপুরের মাসতুত ভাইটি সম্পর্কে আমার তিক্ততা ও বিদ্বেষ যেন একটু কমল।

হাত পা ধুয়ে খেতে বসেছি, তখন মা কথাটা তুলল।

'গণেশের সঙ্গে আলাপ হয়েছে তোর?'

'না তো, এসে দেখি বাবার বসবার ঘরে সোফার ওপর হাত পা ছড়িয়ে ঘুমোচ্ছে। সারা দুপুরই ঘুমোচ্ছে বুঝি?'

মা অল্প হাসল।

'সোদপুর থেকে হেঁটে এসেছে। অতটা রাস্তা হাঁটা যায়। ওইটুকুন ছেলে। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।'

'কেন, বাস বা ট্রেনের পয়সা জোটাতে পারেনি বুঝি?'

'ভীষণ গরীব। একবেলা খাচ্ছে তো আর একবেলা উপোস থাকছে।' মা গম্ভীর হয়ে গেল।

'এখানে কদিন থাকবে?'

'তার ঠিক কি। বলছে কাজকর্মের চেষ্টায় এসেছে।'

'চাকরি।' আমি প্রবলবেগে মাথা নাড়লাম। 'ওই চেহারায় কেউ চাকরি দেবে না।' একটু থেমে পরে বললাম, 'কন্দুর লেখাপড়া করেছে শুনি?'

'লেখাপড়া আর হল কোথায়। বলছিল সেভেন কেলাসে উঠে আর পড়া চালাতে পারেনি। ইস্কুলের মাইনে দিতে পারে না। নাম কাটা গেছে।'

'তবেই হয়েছে। সাত ক্লাসের বিদ্যা নিয়ে চাকরি! অফিসের বেয়ারার কাজও জুটবে না।'

'না, চাকরি করবে কেন, চাকরি করতে আমি দেব নাকি ওই দুধের ছেলেকে। আমার কাছে যখন এসেছে, দেখি, আবার ইস্কুলে ভর্তি করে দিতে পারি কিনা।'

যেন দুঃস্বপ্ন দেখে আঁৎকে উঠলাম।

'এখানে? আমাদের স্কুলে? আমার সঙ্গে রোজ যাবে?'

'কেন,' আমার চেহারা দেখে মা ঈষৎ হাসল। 'তুই কি মাথায় করে নিয়ে যাবি ওকে!'

'ধেৎ, সেকথা বলছে কে।' গজ গজ করে উঠলাম, 'দাঁড়িগোঁফ গজিয়েছে, এখন যদি ও আবার সেভেন ক্লাসে পড়তে যায় সবাই হাসাহাসি করবে। আমার ভীষণ লজ্জা করবে ওর সঙ্গে স্কুলে যেতে—আমি কাউকে বলতেই পারব না এমন গেঁয়ো জংলী চেহারার ছেলে আমার আত্মীয়—মাসতুত ভাই।'

'ছি!' মা ধমকের সুরে বলল, 'ভাইকে এসব বলে নাকি কেউ? গেছো জংলী হবে

কেন, তোর চেয়ে ওর মুখখানা দেখতে বেশি সুন্দর।' একটু থেমে মা কী চিন্তা করল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি সেজেগুজে থাক, আদর যত্নে আছ তাই মাজাঘষা চেহারা। না হলে গণেশের গায়ের রং তোমার চেয়ে ভাল। আর অতবড় ছেলে সেভেন কেলাসে ভর্তি হলে ছেলেরা হাসবে—তা হাসুক, সব বয়সেই মানুষ সব কেলাসে পড়তে পারে, লেখাপড়ায় আবার নিন্দা আছে নাকি।'

'ওই বয়সে কলেজে পড়লে মানাত।' হাসতে যাচ্ছিলাম। মা ভুরু কোঁচকালো।

'ওই দেখতেই মনে হয় না জানি কত বয়স হয়েছে গণেশের, আসলে ওর শরীরের বাড়টা একটু বেশি, দেখছি কেমন যেন ঢ্যাঙ্গা হয়ে উঠেছে এদিকে। ও কিন্তু তোরও ছ মাসের ছোট।'

চমকে উঠলাম, মার কথাটা বিশ্বাস করতে কেমন বাধল।

'তুই হয়েছিস এক ফাল্গুনে, আর তার জন্ম ঠিক পরের ভাদ্রে। হিসাব করে দ্যাখ্ না।' মা আঙুলের কর গুণতে আরম্ভ করল। ঠিক এমন সময় চোখ রগড়াতে রগড়াতে সেখানে গণেশ এসে হাজির। গালে লালার দাগটা তখনো লেগে আছে। যেন মার চোখে তা পড়ল না।

'ঘুম ভাঙ্গল,' আদুরে গলায় মা বোনপোকে কাছে ডাকল, 'আয় একটু দুধ পাউরুটি খেয়ে নে। এই যে খোকন এসেছে। তখন না বার বার বলছিলি, দাদার ইস্কুল কখন ছুটি হবে কখন বাড়ি আসবে।'

পাছে আমার সঙ্গে চোখাচোখি হয় সেই ভয়ে আমি তাড়াতাড়ি দেয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম। কিন্তু টের পেলাম, সদ্য ঘুম ভাঙ্গা করমচা রঙের বড় বড় চোখ দুটো মেলে ধরে সোদপুরের মানুষটা আমাকে গভীর আগ্রহের সঙ্গে দেখছিল।

আর তখন থেকে আমিও তাকে নতুন চোখে দেখতে লাগলাম। আমি কালো, তার গায়ের রং বেশ ফর্সা। আমার চোখ ছোট, তার চোখ দুটো বড় বড়, উঁচু ধারালো নাক—আমার নাক চেপ্টামতন। বয়সে ছোট হয়েও সে আমার চেয়ে মাথায় লম্বা হয়ে গেছে। সেই অনুপাতে তার হাত পা গলা পিঠ কোমর সবই আমার চেয়ে বড় মোটা ও পুষ্ট। মার কাছে বসে সে যখন দুধরুটি খাচ্ছিল মার ঘরের বড় আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিয়ে একটা চোরা দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

অবশ্য আমার মনের ক্ষোভ বেশিক্ষণ রইল না। সোদপুর মানে পাড়া গাঁ। বন জঙ্গলে ভর্তি। সেখানকার মানুষগুলিকে তুমি বুনো জংলী বলতে পার। শহরের মানুষের চেয়ে বুনো জংলীরা বেশি উঁচু লম্বা জোয়ান জবরদস্ত হবেই। আগাছার মতন তারা বেড়ে ওঠে। আমাদের বালিগঞ্জের পার্কের একটা গাছের সঙ্গে জঙ্গলের একটা গাছের তুলনা করলে বেশকমটা যেমন চোখে পড়ে। বাবা সেদিন কি কথায় যেন বলেছিলেন, সভ্য মানুষ চিন্তাশীল মানুষ, দিনরাত যারা এ-ব্যাপারে সে-ব্যাপারে বুদ্ধি খরচ করে বেড়াচ্ছে তারা বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও ক্ষয় করছে—কাজেই অসভ্য জংলী জানোয়ারদের মতন প্রকাণ্ড একটা দেহ সভ্য মানুষদের বড় একটা হয় না। অর্থাৎ বাবা বলতে চেয়েছিলেন, কেবল শরীরের দিক দিয়ে বেড়ে যাওয়া অসভ্যতার লক্ষণ। এখানেও তাই। গণেশচন্দ্রের লম্বা হাত পা চওড়া কাঁধ কোমর আমাকে আর ঈর্ষান্বিত করতে পারল না। কেবল তার নাক চোখ ও ফর্সা রংটাই যা থেকে থেকে মনটাকে খোঁচা দিতে লাগল।

কিন্তু ঝাঁটার কাঠির মতন মাথার খাড়া খাড়া চুল ও অপরিচ্ছন্ন থুতনির ছবিটা মনে করে সেই খোঁচাটাও একসময় ভুলে যেতে পারলাম। পাছে সে আমার পিছু নেয় তাই তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সোজা আমাদের লেক-ক্লাবে চলে গেলাম। মনের আনন্দে সেখানে সারাটা বিকেল বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলা করলাম। বাড়িতে এক হবচন্দ্র মাসতুত ভাই এসেছে কথাটা অনেকক্ষণ ভুলে ছিলাম।

ক্লাবের পিণ্টু ও নন্তুর সঙ্গে লেকের ধারে বসে গল্প করে সন্ধ্যাটাও কাটালাম। কিন্তু যখন বাড়ি ফেরার সময় হল সেই মুখটা আমার মনে পড়তে আরম্ভ করল।

'কি হল, হঠাৎ চুপ করে গেলি যে?'

নন্তু প্রশ্ন করছিল। জোর করে হাসলাম।

'না ভাবছি, এখনি গিয়ে আবার বই নিয়ে বসতে হবে।'

'ও, তার জন্য মন খারাপ।' পিণ্টু হাসল, 'পড়ার বই পড়তে আমার যখনই খারাপ লাগে আমি স্রেফ একটা সিনেমার কাগজ খুলে বসি।'

'কাগজটা বুঝি টেক্‌সট বইয়ের তলায় লুকিয়ে রেখে পড়তে বসিস?'

'তা ছাড়া কি।' পিণ্টু গম্ভীর হয়ে গেল। 'কত আর নাসিরুদ্দিন মামুদ আর গিয়াসুদ্দিন বলবন মুখস্ত করা যায়। কাজেই তখন—'

'কাজেই তখন সিনেমার কাগজটা খুলে দূরের-মায়া বইয়ের নতুন নায়িকা—কি যেন নাম?' নন্তু আমার দিকে তাকাল।

'চামেলী চ্যাটার্জি।' হেসে বললাম।

'চামেলীর মুখখানা দেখি—কেমনরে পিণ্টু।' পিণ্টুর পিঠে আঙুল দিয়ে খোঁচা দিল নন্তু।

'মাইরি বলছি।' পিণ্টু দু চোখ বুজে ফেলল, 'চামেলীকে আমি ঘুমের মধ্যেও স্বপ্নে দেখি।'

'ধেৎ, তার চেয়ে প্রথম-পলাশ-ফুলে যে মেয়েটা নামছে—কি যেন রে নাম, খোকন?' নন্তু আমার দিকে তাকাল।

'ইরা সোম।' বললাম আমি।

'অনেক বেশি মিষ্টি চেহারা।' নন্তু চোখ দুটো প্রায় বুজে ফেলল।

'আমার ভাই স্বাতী সেনের মুখটাই সবচেয়ে বেশি ভাল লাগে। মরুর-বুকে ছবির নায়িকা।' বললাম, 'তোদের বলতে বাধা নেই, জিওম্যাট্রি পড়ার আগে আমি অনেকক্ষণ ধরে স্বাতীর মুখখানা দেখে নিই।'

'জিওম্যাট্রি বইয়ের ভিতর স্বাতীর ফটো লুকিয়ে রাখিস নিশ্চয়?' নন্তু প্রশ্ন করল।

'তা ছাড়া কি।' আমি হাসলাম।

'সত্যি, কত আর ট্রাপিজিয়ম আর রম্বস মুখস্ত করা যায়।' পিণ্টু এতক্ষণ পর আবার হাসল। 'আয় এইবেলা সিগারেট খাওয়া যাক।' পিণ্টুর জামার পকেট থেকে তকতকে ঝকঝকে একটা নতুন প্যাকেট বেরিয়ে এল। তিনজন প্রাণভরে লেকের ধারের মিষ্টি হাওয়া খেতে খেতে সিগারেট টানলাম। বাড়িতে লুকিয়ে সিগারেট খেয়ে আরাম হত না বলে তিন বন্ধু রোজ সন্ধ্যার দিকে এমন একটা নির্জন জায়গা বেছে নিয়ে ধূমপানের আসর জমাতাম।

একটু রাত করে বাড়ি ফিরলাম। যেন মাংস রান্না হচ্ছিল। গন্ধ পেলাম। আশ্বস্ত

হওয়া গেল। মা যেদিন মাংস রান্না করে বাবা সেদিন রান্না ঘরে বসে থাকবেনই। অসীম উৎসাহ তাঁর এ-ব্যাপারে, দরকার হলে হাতা দিয়ে উনুনের হাঁড়িটা দুবার নেড়েচেড়ে দেন তিনি। কাজেই রাত করে বাড়ি ফেরার জন্য আর ভয় রইল না, বাবার সামনে পড়তে হল না, চট করে বাথরুমে ঢুকে মুখ হাত ধুয়ে সোজা পড়ার ঘরে ঢুকে পড়লাম। আলো জ্বেলে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে টেবিলের বইয়ের সারিটা একবার দেখে নিলাম, টানা খুলে ভিতরটা একবার পরীক্ষা করলাম। দুশ্চিন্তা দূর হল। গণেশচন্দ্র তা হলে এবেলাও আমার ঘরে ঢোকেনি। নিশ্চিন্তমনে চেয়ারে বসে জ্যামিতি বইটা টেনে আনলাম। না, আনতে গেছি, হঠাৎ যেন চৌকাঠের কাছে পায়ের শব্দ হল। বই থেকে হাতটা আপনা থেকে সরে এল। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের দিকে তাকাতে দেখলাম দরজায় সেই মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে, হাঁ করে আমাকে দেখছে। ড্যাবড্যাবে চোখ দুটো দিয়ে আমাকে গিলছে মনে হল।

'কি চাই?' এই প্রথম আমি তার সঙ্গে কথা বললাম, 'এখন না, এখন এ-ঘরে না। আমি পড়াশোনা করব—আমার অনেক পড়া।'

ঠিক তখন মা এসে দরজায় দাঁড়াল।

'আহা এমন করিস কেন—তোর ভাই, খুব ভাল ছেলে গণেশ। সারাদিন আশায় আশায় থেকেছে কতক্ষণ তুই ওর সঙ্গে কথা বলবি।'

চুপ করে গেলাম।

মা আবার বলল, 'তখন তুই স্কুল থেকে এসে খেয়ে আবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে গেলি। ও খুজল তোকে, বারান্দায় গেল, বাড়ির সামনের রাস্তাটা দেখল—তুই নেই।'

'আমি আমাদের ক্লাবে গিয়েছিলাম।' অন্যদিকে তাকিয়ে রুষ্ট গলায় বললাম, 'ছুটির পর বাড়ি এসে রোজ ক্লাবে চলে যাই তুমি তো জানই।'

'আমিও গণেশকে বললাম। ও চাইছিল তোর সঙ্গে বেড়াতে যেতে, বলছিল, দাদা এখন পর্যন্ত একটা কথাও বলল না মাসিমা।'

রান্নাঘর থেকে বাবার কাশির শব্দ ভেসে আসতে শুনলাম। বুঝলাম বাবাকে হাঁড়ির কাছে বসিয়ে রেখে মা বোনের ছেলেকে সঙ্গ করে এনেছে আমার সঙ্গে মেলামেশার কথাবার্তা চালানোর সূত্রটা ধরিয়ে দিতে। যেন কচি খোকা। হাঁটি হাঁটি পা পা। অথচ কতবড় একটা শরীর! ছ ফুট লম্বা হবে। কাজেই একটা মস্ত 'ইডিয়ট' ছাড়া আর কিছুই না। মনে মনে বললাম।

'এখন পড়াশোনা কর, তারপর খাওয়াদাওয়া হয়ে যাক—ওর সঙ্গে কথা বলবি। খুব দুঃখ করছিল গণেশ তুই কথা বলছিস না বলে।' মা ঘুরে দাঁড়াল, 'দেখি, মাংসটা বোধ করি হয়ে এল।' রান্নাঘরের দিকে আবার চলল মা। সেই মূর্তিও আর দাঁড়াল না। মাথাটা নীচু করে মার পিছে পিছে চলে গেল। আমার রকমসকম দেখে বুঝতে পেরেছে সে আমি তাকে ভয়ংকর অপছন্দ করছি। তাই আমি বুঝতে দিতে চাইছিলাম।

বাবা ও মার কথার ধরনে বুঝলাম গণেশ পাকাপাকিভাবে এবাড়িতে থেকে যাবে। ভাদ্র মাস। এখন স্কুলে ভর্তি হওয়ার অসুবিধা আছে। নতুন সেশন আরম্ভ হলে আমার স্কুলে ভর্তি হবে। মাংস ভাত খাচ্ছিলাম। কিন্তু তবু মুখে কেমন তেতো তেতো লাগছিল সব। আমার এপাশে বাবা বসে খাচ্ছেন, ওপাশে খেতে বসেছে বুনোটা। আড়চোখে

তাকিয়ে দেখলাম কী ভীষণ খেতে পারে মার সোদপুরের বোনের ছেলে। এক থালা ভাত উড়ে গেছে কখন। মা আবার থালায় এত ভাত ঢেলে দিয়েছে। তা-ও সে সাবাড় করে আনল, অথচ আমার এক বারের ভাত নড়ছে না। বাবা আর কটা ভাত খান। তবু মা বোনপোর সামনে বসে থেকে বারবার সাধাসাধি করছিল, 'এটা খা, ওটা খা—আর দুটি ভাত খেয়ে নে।' দুটি মানে আর এক থালা। রাগে আমার শরীর ফেটে যাচ্ছিল। আবার হাসিও পাচ্ছিল। এই আদর কদিন! ইস্কুলে ভর্তি হোক। ওই সেভেন ক্লাসেই তিনবার ডিগবাজী খাবে এই ছেলে। তখন দেখা যাবে থালা থালা ভাত খাচ্ছে দেখে মা কী করে। আমি জানি মা কোনোদিন বেশিভাত খাওয়া দেখতে পারে না। সুদাস নামে আমাদের এক চাকর ছিল। এইটুকুন ছেলে। অথচ পারলে হাঁড়ির সব ভাত খেয়ে নিত। মা এক একদিন এমন বিরক্ত হত। বাবা বলতেন, যাদের ব্রেণ-ওয়ার্ক অর্থাৎ মাথার কাজ করতে হয় না তারা বেশি ভাত খায়। যেমন মুটে মজুর রিক্সাওয়ালারা। অতিরিক্ত ভাত খাওয়া ছোটলোকের লক্ষণ। মা বলত, দারিদ্র্যের চিহ্ন। অথচ আজ বাবা তো চুপ করে আছেনই, মা আদর করে আর একজনকে ঠেসে ঠেসে খাওয়াচ্ছে। কাজেই আমি চুপ করে রইলাম। যারা ভাত দেবার মালিক তাদের চোখে যদি এই রাক্ষুসে-খাওয়া ভাল লাগে তো আমি কী করতে পারি। বস্তুত এত ভাল মাংস রান্না হওয়া সত্ত্বেও আমি তেমন করে খেতে পারলাম না। মার আদর দেখে হিংসায় আমার বুকের ভিতরটা পুড়ে যাচ্ছিল।

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকতে মা আবার তাকে সঙ্গে করে আমার ঘরের দরজায় এসে দাঁড়াল। মার হাতে একটা বড় বালিশ।

'গণেশ এ-ঘরে তোর সঙ্গে শোবে।'

'এইটুকুন তো একটা খাট।' আমার মুখ কালো হয়ে গেল। করুণচোখে মার দিকে তাকালাম। 'তোষকটাও ছোট—দুজনের অসুবিধা হবে।'

'তোমার সবতাতেই অসুবিধে—এমন কোনো ছোট বিছানা না তোমার—দু ভায়ে বেশ শুতে পারবে।'

তবু আমি বিড়বিড় করছিলাম।

'বাবার বসবার ঘরটা তো খালি পড়ে থাকে—সেখানে একজন শুতে পারে।'

'সে ঘরে বঙ্কু শোয় তুই জানিস না।' আগের চেয়েও জোরে ধমক লাগাল মা। 'চাকরের সঙ্গে গণেশকে আমি শুতে বলব নাকি—কেন, তোমার ঘর থাকতে—' বলতে বলতে মা ভিতরে ঢুকল, হাতের বালিশটা আমার বিছানার ওপর রাখল। 'আয় ভিতরে আয়, গণেশ।'

গণেশ ভিতরে ঢুকল। মুখখানা এখন হাসি হাসি। অর্থাৎ আমার আপত্তি টিকছে না বুঝতে পেরে খুশি হয়েছে। ঈশ্বর জানে, রাগে আমার তখন কী করতে ইচ্ছা করছিল! কিন্তু মার জন্য মুখ বুজে সব সহ্য করতে হল। বিছানার চাদরটা টেনেটুনে ঠিক করে দিয়ে দুটো বালিশ পাশাপাশি সাজিয়ে রেখে মা ঘুরে দাঁড়াল।

'তুই এখন শোবি?'

'আমার অনেক পড়া আছে।' মার মুখের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করছিল না।

'গণেশ, তোর তো ঘুম পেয়েছে—শুয়ে পড়।'

'আমি পরে শোব, মাসিমা।'

'বেশ তো, থোকন, তোর একটা গল্পের বইটই থাকে তো ওকে দে, বসে বসে দেখুক।'

'গল্পের বই আমি রাখি না। সব টেক্সট বই।' দুজনের কারোর দিকে না তাকিয়ে গম্ভীর গলায় উত্তর করলাম।

'বেশ, তবে গণেশ তুই ততক্ষণ বারান্দায় এসে একটু বোস—চমৎকার ফুর ফুরে হাওয়া ওখানটায়।'

মা চৌকাঠের দিকে সরে গেল। আড়চোখে আমি তাকিয়ে দেখছিলাম যাকে বারান্দায় যেতে বলা হল সে কি করে। গেল না বারান্দায়। বিছানার ধারে দাঁড়িয়ে হাঁ করে আমাকে দেখছে, টেবিলটা দেখছে, বইগুলি দেখছে। যেন আজব দেশে এসেছে। আমি আজব দেশের মানুষ। রাগ হচ্ছিল, আবার হাসি পাচ্ছিল, আর সেই সঙ্গে অহংকারে গর্বে বুকের ভিতরটা ফুলে উঠছিল। দেখবেই তো, আমার দিকে বার বার তার না তাকিয়ে উপায় কি! মোটে ছ মাসের বড় হয়ে আমি দু ক্লাস উঁচোয় পড়ছি। আমার কত বই! আর সবগুলি বই কেমন চমৎকার বাঁধানো চকচকে। কতবড় একটা টেবিল আমার, সুন্দর একটা টেবিল-ল্যাম্প, একটা চেয়ার, ধবধবে বিছানা। একলা আমি পড়াশোনা করব বলে থাকব বলে এই ঘর। দেয়ালের গায়ে ব্র্যাকেটে আমার সার্ট প্যান্ট ধুতি পাঞ্জাবি গেঞ্জি পায়জামাই বা ঝুলছে কত। সোদপুর থেকে খালি পায়ে ও হেঁটে এসেছে। আর আমার জুতো চটি মিলিয়ে চার পাঁচ জোড়া। তাই অবাক হয়ে চোখ ঘুরিয়ে সব দেখছে সে। বিছানা জামাকাপড় জুতো বই চেয়ার টেবিল দেখা শেষ করে তারপর এসবের যে মালিক তাকে দেখছে; খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে। নিশ্চয় লক্ষ্য করেছে আমার গাল মুখ কত পালিশ পরিচ্ছন্ন—মাথার চুল কেমন পরিপাটি, হাতের নখগুলি কত সুন্দর মসৃণ করে কাটা। গাঁয়ের মানুষ। কাজেই তার জানবার কথা না আমাদের শহরের ছেলেদের সারাক্ষণ কেমন পরিচ্ছন্ন ফিটফাট থাকতে হয়। বেশভূষায় চেহারায় চালচলনে আমরা পান থেকে চুনটুকু খসতে দিই না। আস্তে আস্তে জানবে কেন আমাদের এত ফিটফাট মাজাঘষা চেহারা হয়ে থাকতে হয়। রোজ চন্দন সাবান গায়ে মেখে আমি স্নান করি, মাথায় ভাল সেণ্টেড তেল মাখি, স্নো ক্রীম পাউডার উঠতে বসতে মুখে মাখছি। বুনো জংলীদের এসব জানবার কথা না, এসবের খোঁজখবরও রাখে না তারা। তাই আমার চকচকে চেহারা তাকে এত অবাক করেছে।

সকালের মতন টেবিলের কাছে সরে এসে দাঁড়াল সে।

'কি চাই?'

'কিছু না।' এবার আমার প্রশ্নের উত্তর দিল সে। দাঁতগুলি বেরিয়ে পড়ল। খামকা হাসবার অভ্যাস, বুঝলাম।

'কিছু চাই না তো ওদিকে সরে দাঁড়া।' বিরক্ত গলায় বললাম, 'আমি এখন পড়ব।'

'আমি তোমার ইস্কুলে ভর্তি হব, মাসিমা বলেছেন।'

'ওই চেহারা নিয়ে বালিগঞ্জ বয়েজ স্কুলে ঢুকতে হবে না।'

'কেন!' যেন আকাশ থেকে পড়ল এমন চেহারা করে ফেলল সোদপুরের মাসিমার ছেলে। চেহারাটা দেখে আমার ভাল লাগল। মুখটা অনেকক্ষণ ভার করে রেখে পরে একটা ঢোক গিলল।

'তোমার সঙ্গে যাব—তুমি আমার দাদা—ঢুকতে দেবে না কেন?'

'দাদা বললেই তো তারা তা বিশ্বাস করছে না।'

চুপ করে রইল সে।

'থুতনিতে পেঁয়াজের শিকড়ের মতন কী কতগুলো ঝুলছে, ঝাঁটার কাঠির মতন মাথার চুল, বড় বড় নখ হাতে পায়ে—ইস্কুলের ছেলেরা গাড়ল ছাড়া আর কিছুই ভাববে না—'

হাঁ করে তাকিয়ে থেকে আমার কথাগুলি শুনল সে, তারপর একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। বনের পশুকে আঘাত করার যে আনন্দ সেরকম একটা কিছু আমি ভিতরে ভিতরে অনুভব করছিলাম।

আর কিছু আপাততঃ বলার প্রয়োজন নেই। ওতেই যথেষ্ট কাজ হবে। চিন্তা করে একটা পড়ার বই টেনে এনে মনে মনে পড়তে সুরু করে দিলাম। অবশ্য পড়ায় আমার এক ফোঁটাও মনোযোগ ছিল না। আড়চোখে দেখছিলাম, গাড়লটা মেঝের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। অর্থাৎ দুর্ভাবনার অথই জলে হাবুডুবু খাচ্ছে। আমার ভাল লাগল। অন্তত রাক্ষুসে দাঁতগুলো বার করে আমার সামনে অকারণে আর সে হাসবে না। বলতে কি ওই বোকা হাসিটাই আমার মাথা গরম করছিল বেশি।

কিন্তু দেখা গেল আমার কথাগুলি সে মনেপ্রাণে ধরে রেখেছে। পরদিন সকালে মার কাছে আর্জি পেশ করল। মা তৎক্ষণাৎ বঙ্কুকে দিয়ে বোনের ছেলেকে চুল কাটার সেলুনে পাঠিয়ে দিল। রাত্রে তার পাশে শুয়ে সত্যি আমার ঘুমোতে কষ্ট হচ্ছিল। গায়ের ঘাম ময়লার উট্‌কো গন্ধে বমি আসছিল। আমি বার বার উঃ আঃ করেছিলাম। দুর্গন্ধ শব্দটাও উচ্চারণ করেছিলাম। তাই পরদিন দেখলাম সেলুন থেকে চুলটুল কেটে এসে গণেশচন্দ্র বাথরুমে বসে দারুণভাবে সারা গায়ে সাবান মাখছে। খুশি হলাম। বুনোটা আমার মতন হতে চাইছে। স্নানের পর ধোপদুরস্ত জামাকাপড় পরল। এগুলো বাবার। ছ ফুট লম্বা শরীরে আমার সার্ট পাঞ্জাবী প্যাণ্ট পায়জামা ধরবে না। না হলে পুরোনো বা একটু ছেঁড়ামতন সার্ট প্যাণ্ট আমারই কি কম বাক্সে তোলা আছে। আমার মতন বাবারও ভয়ংকর নাক টান। একটু সুতো উঠে গেলে কি জেলজেলে হয়ে গেলেই সার্টটা পায়জামাটা আর গায়ে তুলতে চান না তিনি। মা সেগুলি ধুইয়ে এনে তুলে রাখে। এখন সেসব কাজে লাগল।

দেখতে মন্দ লাগছিল না সোদপুরের মাসির ছেলেকে। রংটা ফর্সা তো। চুল কেটেছে, গায়ের ময়লা পরিষ্কার করেছে; তার ওপর ধোয়া পাঞ্জাবি পায়জামা গায়ে চড়িয়েছে। আমার পড়ার ঘরে ঢুকে দাঁত বার করে সে হাসছিল, ধরে নিয়েছে আমি তার ওপর এখন বেজায় সন্তুষ্ট। কিন্তু সেরকম কোন লক্ষণ আমি প্রকাশ করলাম না। গম্ভীর হয়ে বললাম, 'ঐ বুনোই থেকে গেলি?'

'কেন?' তার মুখের হাসি নিভে গেল।

আমি আঙুল দিয়ে থুতনিটা দেখালাম।

নিজের থুতনির ওপর হাত বুলিয়ে সে বুঝতে পারল ব্যাপারটা। কিন্তু যেন এখানে তার কিছু করবার নেই—সম্পূর্ণ নিরুপায়, এমনভাবে সে আমার দিকে তাকাল। তেমনি গম্ভীর থেকে আমি টেবিলের টানা খুলে সেফ্‌টি রেজারটা বার করলাম, চটপট হাতে রেজারে নতুন ব্লেড পরালাম, দেওয়াল থেকে ছোট আরসিটা নামিয়ে টেবিলের ওপর দাঁড় করিয়ে রাখলাম, মুখে সাবান মাখা বুরুশ ঘষলাম—তারপর পাঁচ সাত মিনিটের কাজ। আমার মুখটা দেখতে দেখতে ডিমের মতন মসৃণ তকতকে হয়ে উঠল। ড্যাবড্যাবে চোখ মেলে গণেশ এতক্ষণ আমায় দেখছিল। দেখা শেষ করে সে একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

এখন আর দাঁত বার করল না, অল্প হেসে আস্তে আস্তে বলল, 'মুখের চুলগুলি একদিন কাঁচি দিয়ে কাটতে গেছলাম—আর বাবা দেখতে পেয়ে এমন মার দিল—'

'বাবার সামনে কাটতে গেলে মার দেবেই।' দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে অল্প হেসে বললাম, 'বাবা মা-কে দেখিয়ে সব কাজ করতে গেলে তবেই হয়েছে।'

প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিলল গণেশ।

'আমার তো ওই যন্তরটন্তর কিছু নেই।'

'এটা দিয়েই এখন কাজ চালাবি—আর একটা নতুন ব্লেড দেব ওটা পরিয়ে নিবি—দুপুরে মা যখন ঘুমোবে তখন এ-ঘরে বসে চুপি চুপি—বুঝলি?'

খুশি হয়ে সে ঘাড় কাত করল।

'কিন্তু সাবধান—আমার সেফটি রেজার খুব ভাল করে ধুয়ে মুছে রাখা হয় যেন—নোংরামী আমি একেবারে পছন্দ করি না।'

গণেশ এবারও ঘাড় কাত করল।

এক সেকেণ্ড কথাটা চিন্তা করলাম, তারপর চোখের ইসারায় দোরটা আর একটু ভাল করে ভেজিয়ে দিয়ে আসতে বললাম গণেশকে। দেখলাম, আমি যা বলছি, যা করছি তাতেই তার প্রচণ্ড উৎসাহ।

আমার উৎসাহ অবশ্য অন্যদিক থেকে। একটা বুনোকে আমি শিখিয়ে পড়িয়ে মানুষ করে তুলছি। যেমন খেলা দেখাবার জন্য সার্কাসের দলের লোকেরা বনের পশুকে শিখিয়ে পড়িয়ে তোলে। সার্কাসের সিম্পাঞ্জী দাঁড়ি কামায় সিগারেট টানে খবরের কাগজ পড়ে আমার দেখা আছে। যেন সোদপুরের গণেশ সম্পর্কেও আমার সেই ধরনের উৎসাহ।

সিগারেটটা প্রায় শেষ করে এসেছি। গণেশ একভাবে তাকিয়ে আছে। মাঝে মাঝে ঢোক গিলছে।

'অভ্যাস আছে?' ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলাম।

গণেশ মাথা নাড়ল।

সিগারেটের টুকরোটা তার হাতে তুলে দিলাম, বললাম, 'অভ্যাস নেই যখন খুব আস্তে টান দিবি।'

আস্তে আস্তে টানল সে। কিন্তু তা হলেও চোখমুখ লাল হয়ে গেল। দুবার খুক করে কাশল।

'থাক আর দরকার নেই—ফেলে দে, প্রথমটায় বেশি ধোয়া গিলতে গেলে বেদম কাশতে সুরু করবি।'

আর একটা বড় করে টান দিয়ে গণেশ জ্বলন্ত টুকরোটা হাত থেকে ফেলে দিল। আমি পা দিয়ে মাড়িয়ে আগুনটা নিভিয়ে দিলাম। তারপর সেটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে জানালা গলিয়ে দূরে বাগানের ঝোপের ভিতরে ফেলে দিলাম।

গণেশের চোখমুখের লাল ভাবটা তখনো কাটেনি। নাকের ছিদ্র দিয়ে একটু একটু ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।

'মাসিমা জানতে পারলে ভীষণ বকুনি দেবে।'

'মাসিমাকে জানাচ্ছে কে আহম্মক।' চাপা গলায় গর্জন করে উঠলাম। ধমক খেয়ে মার বোনপো রাগ করল না। বরং যেন নিশ্চিন্ত হল।

'বাবা আমায় কেবল বলত, সাবধান কারো সঙ্গে মিশে বিড়িসিগারেট যেন আবার অভ্যাস করতে আরম্ভ করিস না, তা হলে মগজ পেকে যাবে—লেখাপড়া হবে না।'

কথা শুনে হাসলাম।

'ছ ফুট লম্বা হয়েছিস মাথায়—এখনো কি তোর মগজ কাঁচা আছে ধরে নিয়েছিস।' একটু থেমে পরে বললাম, 'গাঁয়ের মানুষ তোর বাবা— কি খেলে কি হয় আর কি না খেলে না হয় বড় জানে কিনা, বিড়ি সিগারেট না খেয়ে তুই কোন্ পি. আর. এস পি. এইচ-ডি হয়েছিস শুনি?'

ইংরেজী শব্দগুলি গণেশ বুঝল না, কিন্তু আমার কথাটা বুঝতে পারল তার চোখ দেখে টের পেলাম। মুখ নীচু করে আছে। আমি যে অতি সত্যি কথা বলছি তাতে তার বিন্দুমাত্র সন্দেহ হচ্ছে না। সিগারেট টেনে টেনে আমি ঠোঁট কালো করে ফেললাম অথচ নাইন ক্লাশে পড়ছি—এত এত বই আমার; কথাটা সে না ভেবে পারে না। তাই আমি চুপ করতে চোখ তুলে সে আমার হাতের সিগারেটের প্যাকেটটা আবার দেখতে লাগল। তাজা মাছ দেখে বিড়াল যেমন করে তাকায়। বুনোটার এই তাকানো আমার ভাল লাগল।

মা মহাখুশি। গণেশ আর আমার কাছছাড়া হয় না। যতক্ষণ আমি বাড়িতে গণেশ আমার সঙ্গে আছে, আমার ঘরে আছে। আমার সঙ্গে সে কত কথা বলছে এবং গেঁয়ো ছেলেটা সম্পর্কে আমিও আর মার কাছে কোনরকম খুঁত খুঁত করছি না। 'গণেশ একটু বাবু হয়েছে,' মা মাঝে মাঝে বলে, 'খোকনের সঙ্গে থেকে এটা হয়েছে।' শুনে আমি চুপ করে থাকি। তা তো হবেই, মনে মনে বলি, গেঁয়োটাকে আমি বাবু সেজে থাকতে শিখিয়েছি, সিগারেট ফুঁকতে শিখিয়েছি, একদিন অন্তর দাড়ি গোঁফ কামাতে শিখিয়েছি, আর যখন তখন আমার টেবিল থেকে সিনেমার কাগজগুলি টেনে নিয়ে সুন্দরী অভিনেত্রী রেবা, চামেলী, স্বাতী বা অন্য কোনো মেয়ের মুখের ওপর উপুড় হয়ে থাকতে শিখিয়েছি।

একটা খেলা আমার—একটা আনন্দ। যেন আমার মনের ভাবটা এই, পোষা জন্তুটা আমার সব কিছু অনুকরণ করুক, শিখুক; তারপর কী দাঁড়ায়, কতটা যায় দেখা যাবে।

আমার সেই গোপন চিঠিগুলিও সে দেখল, পড়ল। মিষ্টি হাতের লেখা আদুরে চিঠি, অভিমানের চিঠি, কান্নার চিঠি, উচ্ছ্বাসের অস্থিরতার চিঠি। কে লিখেছে, কাকে লেখা এত সব গোপন পত্র হয়ত বোকাটা বুঝল না। এবং এই জন্য তার মাথা ব্যথাও নেই মনে হত। সিনেমার কাগজ খুলে সুন্দর মুখগুলি দেখতে দেখতে যেমন মাঝে মাঝে সে দীর্ঘশ্বাস ফেলত তেমনি মিষ্টি মিষ্টি চিঠিগুলি পড়া শেষ করে দেয়ালের দিকে চোখ রেখে চুপ করে থাকত আর কী যেন ভাবত।

বুনোটার এই চুপ করে থাকা ও দীর্ঘশ্বাস ফেলাটা আমি উপভোগ করতাম। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। আর অগ্রসর হতে দেওয়া হবে না—আর কিছু শেখানো হবে না। এটা বলেছিল আমাকে আমার ক্লাবের বন্ধুরা। কেননা স্কুলে ক্লাসের কোনো ছেলের কাছে ঘুণাক্ষরেও আমার এমন এক বোকারাম মাসতুত ভাই আছে প্রকাশ করিনি। কিন্তু ক্লাবের নন্তু পিণ্টুদের কাছে গোপন করিনি। বুনোটা সম্পর্কে তাদের সঙ্গে নানা পরামর্শ করার দরকার ছিল বৈকি। লেকের ধারের নির্জন অন্ধকারে বসে তিনজন সিগারেট টানতে টানতে অদৃশ্য গণেশচন্দ্রকে নিয়ে বিস্তর হাসাহাসি করতাম। নন্তু বলত, 'ছ ফুট লম্বা

তার ওপর গায়ের রংটা খুব ফর্সা বলছিস, কাজেই যেটুকু শেখানো হয়েছে ঐ থাক—আর বেশি শেখাতে গেলে তোর ভাত মারা যাবে।' নন্তুর ইঙ্গিতটা বুঝতে কষ্ট হয়নি। পিণ্টু বলছিল, 'হুঁ, ঐ একটা জায়গায় ফাঁক রাখবি—গেঁয়ো গোঁয়ার মানুষ—সব কিছু শেখাবার বিপদ আছে বৈকি।' বন্ধুদের কথা শুনে আমি হেসেছি। আমি যে অনেক বেশি চালাক বন্ধুরা হয়তো ঠিক চিন্তা করে দেখেনি। যদি বুনোটাকে সব কিছু দেখানো শেখানোর মন থাকত তো তাকে নিয়ে নিশ্চয় অন্তত এক আধদিন আমি বাইরে বেড়াতে বেরোতাম। একদিন তাকে আমাদের লেক-ক্লাবের আড্ডায় আনিনি। কি স্কুলের খেলার মাঠে। ওকে সঙ্গে নিয়ে আমি কোনোদিন রাস্তায় বা পার্কেও যেতাম না। যতটা মেলামেশা বা যেটুকু প্রশ্রয় দেওয়া বাড়ির চৌহদ্দীর মধ্যে থেকে। আমার বাইরের জগতে উঁকি দেবার ছাড়পত্র সে পায়নি।

মা মাঝে মাঝে ঘ্যান ঘ্যান করত। ভাইকে সঙ্গে নিয়ে আমি বেড়াতে যাই না কেন। চিড়িয়াখানা, গড়ের মাঠ, মনুমেণ্ট, যাদুঘর কত কি দেখবার আছে। আমি মুখ ভার করে বলতাম, 'আমার সময় নেই।' কাজেই বঙ্কুকে সঙ্গে দিয়ে মা সোদপুরের বোনের ছেলেকে এটা ওটা দেখতে, রাস্তাঘাট চিনতে পাঠাত। আমার কাছে গণেশচন্দ্র এসব আশা করত না যদিও। কেননা বাড়িতে থেকে আমার পড়ার ঘরের দরজার পাল্লা দুটো ভেজিয়ে দিয়ে তাকে যেটুকু দেখিয়েছিলাম চিনিয়েছিলাম তাই নিয়ে সে সন্তুষ্ট ছিল। বস্তুত যদি বা কোনোদিন হাবেভাবে আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোবার ইচ্ছা প্রকাশ করত তো তৎক্ষণাৎ গম্ভীরভাবে আমি মাথা নেড়ে বলতাম, 'এখনো সময় হয়নি, এখনো তোর জংলী ভাবটা পুরোপুরি কাটেনি—তুই আমার মাসতুত ভাই বন্ধুরা যখন শুনবে ভীষণ হাসাহাসি করবে।' সঙ্গে সঙ্গে সে চুপ করে যেত। দেয়ালের দিকে চোখ রেখে ভাবত। তারপর সিনেমার কাগজ খুলে সুন্দর মুখগুলি দেখত। তাকে খুশি রাখতে চট করে প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট বার করে দিয়ে খাতাবই বগলে নিয়ে আমি স্কুলে বেরিয়ে গেছি। স্কুল থেকে ফিরে এসে আবার একটা সিগারেট তার কোলের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আমি ক্লাবে ছুটে গেছি। আমার পড়ার ঘরে বসে বাবা মা কি চাকর বঙ্কুকে টের পেতে না দিয়ে সে যে লুকিয়ে সিগারেট খেতে শিখেছে এই জন্য আমি খুশি ছিলাম। একটু একটু করে বুনোটার বুদ্ধি বাড়ছে, মনে মনে বলতাম।

ছুটির দিনটাই মুস্কিল। অথচ ছুটির দুপুর, রবিবারের দুপুরটাই সবচেয়ে লোভনীয়। বাবা বাড়িতে থাকেন বলে মার চোখে সেদিন আর এক ফোঁটা ঘুম থাকে না। আর সেদিন চুপি চুপি বাড়ি থেকে বেরোবার মতলব করে জামাটা আমি গায়ে চড়িয়েছি কি মা কেমন করে জানি টের পেয়ে আমার ঘরের দরজায় ছুটে আসে।

'গণেশকেও সঙ্গে নিয়ে যা—এখন তো আর স্কুলে যাচ্ছিস না, ক্লাবে যাচ্ছিস না।' মা হেসে বলত। 'গাঁয়ের ছেলেকে তোদের ক্লাবে নিয়ে যেতে লজ্জা করে বলিস, এমনি না হয় ওকে নিয়ে কোথাও বেড়িয়ে আয়।'

সঙ্গে সঙ্গে জামাটা খুলে ফেলি।

'নাঃ বড্ড গরম। বেরোব না।'

মা আর হাসত না, গম্ভীর হয়ে যেত।

'এসব তোমার বাঁদরামী। গণেশকে সঙ্গে নেবার নাম করতে তোমার মাথা ব্যথা

সুরু হল। আশ্চর্য! নিজের মাসতুত ভাই, ধরতে গেলে নিজের মায়ের পেটের ভায়ের মতন!'

আঘাত পেয়ে মা চলে গেছে। আর আমি মনে মনে বলেছি, বরং এই বুনোটাকে আমি সঙ্গে করে স্কুলে নিয়ে যেতে পারি, ক্লাবেও হয়তো এক আধদিন যাওয়া চলে, কিন্তু এখন আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে অসম্ভব। ভাই বলে, ভাই বোন বাবা মা আত্মীয় বন্ধু —পৃথিবীর কাউকে সেখানে নিয়ে যাওয়া চলে না। এক যেতে পারে আমি আর আমার ঈশ্বর। আর তাই তো আমি এমন একটা নির্জন নিঃসঙ্গ দুপুরের অপেক্ষায় ছিলাম। তার ওপর এখন শরৎকাল। নীল আকাশে সাদা মেঘের ভেলা ভেসে বেড়াচ্ছে। নারিকেল পাতার ঝালর থেকে উজ্জ্বল রৌদ্র চুঁইয়ে পড়ছে। নীচে দীঘির জল আয়নার মতন স্বচ্ছ স্থির। আয়নার বুকে গাছের ছায়া, নীল আকাশের ছবি, সাদা মেঘের টুকরো টুকরো প্রতিবিম্ব। আর জলের কিনারে লম্বা সবুজ ঘাস, ঘাসের ডগায় হলদে ফড়িং।

ছবিটা চোখের সামনে ভেসে উঠতে না উঠতে মিলিয়ে গেছে মার জন্য—নষ্ট হয়ে গেছে। এমন করে দুটো রবিবারের ছুটির দুপুর নষ্ট হয়েছে ব্যর্থ হয়ে গেছে। গণেশকে সঙ্গে নিয়ে যা।

আমার কান্না পায়।

আমার সব কিছু থেকে ঐ দুপুর ঐ ছায়া ঐ রং ঘাস জল মেঘের ছবি আলাদা করে রেখেছি। ওখানে আমি ছাড়া আর কেউ থাকে না, থাকতে পারে না।

এর সঙ্গে আমার সিগারেট খাওয়া, লুকিয়ে দাড়ি কামানো, লুকিয়ে সিনেমার কাগজ খুলে সুন্দর মেয়ের মুখ দেখার কোনো যোগাযোগ নেই। মিষ্টি চিঠিগুলিরও না। চিঠি চিঠি। আর কারোর হতে পারে, অন্য কেউ লিখতে পারে। বললেই হল। লেখা হয়ে গেলে পড়া হয়ে গেলে কয়েক টুকরো কাগজ ছাড়া আর কি! সে সব এক দিকে।

আর এখন, পর পর দুটো রবিবার নষ্ট হবার পর, আজ এই তৃতীয় রবিবারের ছুটির দুপুরে আমি যেখানে যেতে চাইছি— আমার একান্ত গোপন সুন্দর নিভৃত জগতে, আর কেউ না, যাকে দেখলে আমি হাসি, ঘৃণা করি, অনুকম্পা করি, সোদপুরের আধা জানোয়ার আধা মানুষের চেহারার বোকারাম গণেশচন্দ্রকে নিয়ে যাওয়ার কথা চিন্তা করে আমি পায়ে মাথায় শিউড়ে উঠলাম।

অথচ আজ পরম সুযোগ। কি একটা কাজে বাবা কলকাতার বাইরে গেছে। মা ঘুমোচ্ছে। আকাশটাও আজ বড় বেশি নীল। মেঘের টুকরোগুলি অতিরিক্ত সাদা। নারিকেল পাতার ঝালর চুঁইয়ে হীরার মতন উজ্জ্বল রাশি রাশি রৌদ্র আয়নার মতন স্থির স্বচ্ছ দীঘির বুকে ঝরে পড়ে না জানি কী শোভা ধরেছে কল্পনা করে আমি যখন জামাটা ব্র্যাকেট থেকে টেনে আনতে যাব আমার দুই চোখ স্থির হয়ে গেল।

'আমি যাব দাদা।'

'কোথায়?'

'তুমি যেখানে যাচ্ছ।'

'আমি তো কোথাও যাচ্ছি না।'

'ঐ তো জামা পরছ।'

স্থির শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে দরজায়। বাবার একটা পুরোনো সিল্কের পাঞ্জাবি গায়ে চড়িয়েছে, সদ্য পাটভাঙ্গা পায়জামা পরেছে। যেন মাকে দিয়ে বাক্স ঘেঁটে এগুলি বার

করে নিয়েছে। অথচ আজ মা উপস্থিত নেই সামনে— পাশের ঘরে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু তার জন্য গণেশ চুপ করে বসে নেই। সেজেগুজে তৈরী হয়ে আছে, আমার সঙ্গে বেরোবে। বুঝলাম কদিনে আর একটু চালাকচতুর সাবালক হয়ে উঠেছে বুনোটা। দাদার সঙ্গে বেড়াতে যাবার জন্য মাসিমাকে দিয়ে আর্জি পেশ করানোর দরকার বোধ করছে না। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আধুলির সাইজের দাঁতগুলি বার করে সে হাসছিল। দেখে মাথাটা গরম হয়ে গেল। তথাপি জামাটা গায়ে চড়ালাম। 'আমি কাজে বেরোচ্ছি।' কঠিন গলায় বললাম, 'যেখানে যাচ্ছি সেখানে তোকে নিয়ে যাওয়া চলে না।'

'কেন চলবে না, তুমি তো এমনি বেড়াতে যাচ্ছ—কাজ আবার কি! আমি যাব।'

হতভম্ব হয়ে গেলাম। চিরুনি বুলিয়ে মাথাটা ঠিক করছিলাম। হাতের মুঠোয় চিরুনিটা স্থির হয়ে গেল।

'এমন গেঁয়ো জংলীকে সেখানে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে আমার লজ্জা করবে।' রাগে আমার ঠোঁট কাঁপছিল।

'মোটেই আর আমি জংলী নই।' রাগ না করে গণেশ নরম গলায় বলল, 'কাল তুমিই বলছিলে; এখন আমাকে রীতিমত শহুরে ছেলে বলা যায়, তোমার মতন রোজ গায়ে সাবান মেখে স্নান করি, দাড়ি কামাই, সিগারেট খাই, পরিষ্কার জামাকাপড় পরি— সিনেমার কাগজ টাগজ নাড়াচাড়া করি—'

ঠাট্টা করে কাল কথাটা বলেছিলাম বটে। মজা দেখতে যে বুনোটাকে আমি আমার সব কিছু শিখিয়েছি দেখিয়েছি তা তার বুঝবার ক্ষমতা থাকত যদি! তাই আর রাগ না করে হাসলাম।

হুঁ, তোর বাইরেটা শহুরে হয়ে গেছে আমি অস্বীকার করছি না, কিন্তু ভিতরটা? মনটা? এখনো কাঁচা, এখনো গেঁয়ো ভাবটা পুরোপুরি রয়ে গেছে— আর একটু চালাক-চতুর না হলে—'

ড্যাবড্যাবে চোখে ছ ফুট লম্বা মানুষটা আমার মুখ দেখল, দীর্ঘশ্বাস ফেলল। যেন সামনে একটা আরসী পেলে তক্ষুণি সে নিজের মুখটা শরীরটা আর একবার ভাল করে পরীক্ষা করে। এখনো গেঁয়ো বোকা রয়ে গেছে আমার কথা শুনে বিশ্বাস করতে পারছে না।

চিরুনি চালিয়ে চুলটা ঠিক করে ফেললাম।

'দরজা থেকে সরে দাঁড়া।' রুমালে খানিকটা সেণ্ট ঢেলে সেটা পকেটে পুরলাম। গণেশ দরজা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঘর থেকে আমাকে বেরোতে না দেবার মতলব? হেসে বললাম, 'ভাদ্দরের কাঠ ফাটা রোদ উঠেছে দেখছিস তো, এখন বাইরে হাঁটতে মোটেই ভাল লাগবে না। তার চেয়ে ফ্যানটা খুলে দিয়ে আমার টেবিলে বসে আরামসে সিগারেট খা, সিনেমার কাগজটা দ্যাখ, মিষ্টি চিঠিগুলো আর একবার পড়তে পারিস।' পকেট থেকে সিগারেট বার করলাম।

কিন্তু আজ আর সিগারেটের জন্য সে আর হাত বাড়াল না। চেহারাটা বিকৃত করে ফেলল। 'চিঠি পড়ে আর ছবি দেখে কেবল কী হবে। অনেক দেখা হয়েছে—অনেক পড়া হয়েছে— তুমি আমায় বাইরে নিয়ে চল।'

'বাইরে তোমার যাওয়া চলবে না। আমার সঙ্গে চলবে না। বঙ্কুর সঙ্গে যেতে পার।' রাগে আবার গজ গজ করে উঠলাম। 'ঐ চেহারা ঐ বুদ্ধি নিয়ে আমার সঙ্গে যেতে চাইছে, কী আস্পর্ধা!'

বললাম বটে, বলার সঙ্গে সঙ্গে আমার চক্ষু স্থির হয়ে গেল। যেন হঠাৎ একটা আগুনের ঝিলিক দেখলাম সোদপুরের মাসির ছেলের চোখে। অথচ দাঁতগুলি ঢেকে রেখে কেমন করে যেন হাসছে, শয়তানের মতন। অস্বস্তি বোধ করলাম।

রাস্তা ছেড়ে দে।' রুখে উঠলাম আমি।

'আমি সব বলে দেব মাসিমাকে।' গণেশ গম্ভীর হয়ে বলল।

'কি বলবি শুনি?'

'তুমি আমায় সিগারেট খেতে শেখাচ্ছ, এই বয়সে গালে রেজার চালাতে শেখাচ্ছ, সিনেমার মেয়ের মুখ রাতদিন দেখাচ্ছ—'

'হায়রে গর্দভ, হায়রে মূর্খ!' মনে মনে বললাম, 'এসব অপরাধের সঙ্গে তুইও জড়িয়ে আছিস, কাজেই বাবা মার কাছে শাস্তি পেতে একলা আমিই পাব না, তুইও পাবি, কথাটা ভেবেছিস?' কিন্তু তথাপি আমার বুকের ভিতর গুড়গুড় করতে লাগল। গেঁয়ো গোঁয়ার মানুষ, কী বলতে আরো সব কী বলে দেয় মাকে চিন্তা করে চট্ করে রাগটা সংবরণ করলাম। পায়চারী করতে লাগলাম ঘরের ভিতর। এদিকে বাইরে রোদ কমলা রং ধরতে সুরু করেছে—সাদা মেঘের ধারগুলি থেকে এখনি পাটকিলে রং ফুটে বেরোবে—নারিকেল গাছের ছায়ারা লম্বা হতে থাকবে, দীঘির জলের স্বচ্ছ আরসীটা কালো হয়ে নিভে যাবে একসময়। বুকের ভিতর হায় হায় করে উঠল। আমার আর একটা ছুটির দুপুর চিরদিনের মতন নষ্ট হতে চলল হারিয়ে যেতে লাগল। কেমন অস্থির হয়ে উঠলাম। অস্থিরতার মধ্যে বুদ্ধি ঠিক করে ফেললাম।

'আচ্ছা, তাই হবে, চ—তুইও সঙ্গে যাবি।' বুনোটার দিকে তাকিয়ে হাসলাম। সেও হাসল। অতিরিক্ত খুশি হবার দরুন দাঁতগুলি আবার বেরিয়ে পড়ল। দুজন ঘরের বাইরে চলে এলাম।

'চমৎকার দুপুর!'

আমি কথা বললাম না।

'আকাশটা নীল—মেঘগুলো কী সাদা!' আমার পিছনে থেকে সে কথা বলছিল। আমি ভাবছিলাম অন্য কথা।

'সত্যি দাদা, তোমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোনো আমার অনেকদিনের ইচ্ছা।' একটু পর আবার বলল ও।

আমার সঙ্গে বেড়াতে বেরোলেই কি আর আমার সমান হওয়া যাবে, মনে মনে বললাম ও হাসলাম। সত্যি, সেখানে গেঁয়োটাকে নিয়ে যাচ্ছি বলে একটু আগে যে ভয়টা হচ্ছিল সেটা তৎক্ষণে কেটে গেছে। আমার ক্লাবের কোনো বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি না, ক্লাসের কোনো ছেলেকেও না। পোষা কুকুরটুকুর যেমন লোকে সঙ্গে নিয়ে যায় তেমনি সোদপুরের এই গাড়লটা আমার সঙ্গে যাচ্ছে। আমাদের বালিগঞ্জের ছেলেদের সে কতটুকু দেখেছে, কী জানে! বাড়িতে দেখেছে আমাকে, আমার পড়ার ঘরে দেখেছে, বাবার সামনে দেখেছে, মার সামনে দেখেছে। তাতে আমার কতটুকু জানা হয়েছে দেখা হয়েছে। তাই মনে মনে হাসলাম।

বরং ওটা সঙ্গে যাচ্ছে বলে উৎসাহটা ক্রমেই বাড়ছিল।

অর্থাৎ বুনোটাকে এই কদিনে অনেক কিছু দেখিয়েছি শিখিয়েছি—না হয় আর

একটু দেখবে শিখবে। আমার বুদ্ধির শিকল দিয়ে যখন ওকে বেঁধে রেখেছি, তখন আর ভয় কি! বরং নতুন একটা খেলা হবে। আর একটু দেখে শিখে গেঁয়োটা কতটা অগ্রসর হয় মজা দেখা যাবে।

ট্রাম ডিপো পিছনে রেখে সরু পথ ধরেছি। তখন থেকে পথের দু ধারে নারিকেল গাছের সারি সুরু হল। একটা দুটো পাখি ডাকছিল মাঝে মাঝে।

'মনে হয় গাঁয়ের রাস্তায় এসে গেছি, দাদা।'

'হুঁ, তোদের সোদপুরের জঙ্গল।'

ঠাট্টাটা সে বুঝল না। সত্যি কোনো জঙ্গলের কাছে এসেছি কিনা দেখতে অবাক হয়ে এদিক ওদিক তাকায় আর চপ্পলের শব্দ করে হাঁটে। বাবার এক জোড়া পুরোনো চপ্পল পরে এসেছে।

'তুই সাঁতার জানিস?'

'খুব।' উৎসাহে লম্বা পা ফেলে আমার সঙ্গে এবার কাঁধ মিলিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করল বুনোটা। 'আমরা কোনো দীঘিটিঘির ধারে যাচ্ছি বুঝি?'

'হুঁ, সংক্ষেপে বললাম, 'পদ্মদীঘি।'

'যদি পদ্ম ফুটে থাকে, আমি সাঁতার কেটে জল থেকে এন্তার ফুল তোমার জন্যে তুলে আনব, দাদা।'

'তাই আনবি।' খুশি হয়েছি এমন ভান করে বললাম, 'এখন শরৎকাল, এখন তো পদ্ম ফোটার সময়।' আর মনে মনে বললাম, বোকাটাকে সঙ্গে এনে ভালই করেছি। আমি সাঁতার জানি না, অথচ মাঝে মাঝে পদ্ম ফোটে, ইচ্ছা থাকলেও দুটো একটা ফুল আমি ওকে তুলে এনে দিতে পারি না।

'এই শোন্।' বললাম, 'গাছে চড়তে পারিস?'

'খুব।' অতিরিক্ত খুশির দরুন গলার এমন ঘোঁৎ শব্দ করে সে হাসল যে প্রথমটায় চমকে উঠলাম, যেন একটা পশুর গলার শব্দ শুনলাম। গলা বড় করে গণেশ বলল, 'গায়ে থেকে মানুষ, গাছে চড়তে শিখব না!'

ভাল, মনে মনে বললাম, ওদের দীঘির পাড়ের বাগানের পেয়ারা গাছে কত পেয়ারা পেকেছে, কামরাঙ্গা গাছে কামরাঙ্গা, অথচ গাছে চড়া শেখা হয়নি বলে একটা ফলও আমি ওকে পেড়ে দিতে পারি না। আজ গাড়লটাকে দিয়ে পদ্ম তুলে আনা, গাছের ফল পাড়া সব কাজ চলবে।

যেন দাদার সব কাজ করে দেবার বল বিক্রম নিয়ে ছ ফুট লম্বা কাঠামোটা আগে আগে হেঁটে চলল। এখন আর তার ওপর আমার বিশ্বেষ নেই, বা তার জন্য লজ্জা পাবার কারণ নেই। এমন একটা প্রয়োজনীয় জন্তু সঙ্গে থাকা দরকার চিন্তা করে হাল্কা মনে আমিও হাঁটতে লাগলাম।

'বাঁয়ে।' পিছন থেকে হেঁকে উঠলাম। গণেশ বাঁ দিকে মোড় নিল। প্রথমে মেহেদীর বেড়া, তারপর মাধবীর ঝোপ, তারপর কাঠমালতির জঙ্গল পার হয়ে সবুজ ঘাসের ফ্রেমে আঁটা সেই আশ্চর্য দীঘির কাছে আমরা এসে গেলাম।

না, জলের আয়নায় নারিকেল গাছের ছায়া, সাদা মেঘ, নীল আকাশের ছবি দেখবার আগে আমার চোখ সরে গেল ওদিকে। করবী গাছের ছোট্ট ছায়ায় দাঁড়িয়ে আছে ও। আমার জন্য অপেক্ষা করছে। নিশ্চয় অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে। আমার দেরি হয়ে গেল

গাড়লটার সঙ্গে তর্ক করতে। শেষ পর্যন্ত যদিও ওটাকে সঙ্গে আনতে হল। মনটা খারাপ হয়ে গেল। নিশ্চয় রাগ করেছে ও আমার এত দেরি দেখে। অন্যদিন দেখা হওয়া মাত্র ছুটে এসেছে। আজ চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। আজ তার বেশভূষা অন্যরকম। ফ্রক না, শাড়ি পরেছে। মেঘের রং। চট্ করে মনে পড়ে গেল। ওটাই তার মেঘডম্বুর শাড়ি। টালিগঞ্জের মাসিমা জন্মদিনে উপহার দিয়েছে, সেদিন বলছিল। এখানেও মাসিমা। কথাটা মনে পড়ে একটু হাসি পেল।

'এই, তুই বোস, নারকেল গাছের ছায়ায় চুপ করে বসে থাক।' বুনোটাকে বসিয়ে দিয়ে আমি করবী গাছের কাছে ছুটে গেলাম।

'চুপ করে আছ কেন?' ওর হাত ধরলাম।

হাত ছাড়িয়ে নিল ও। দু হাত তুলে খোঁপা ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। এই নিয়ে দুদিন আমি তাকে খোঁপা পরতে দেখলাম। যদিও এম্নি বেণী করে রাখলেও ওকে কম সুন্দর দেখায় না। কিন্তু খোঁপা পরলে বেশি সুন্দর লাগে। মেঘডম্বুর শাড়ির সঙ্গে মেঘের থোকার মতন খোঁপাটাই চমৎকার মানিয়েছে। যেমন ফ্রকের সঙ্গে চেরা-বেণীটা ভাল লাগে।

'কথা বলছ না কেন?'

'দু রবিবার আসনি কেন?'

'ও, তাই অভিমান।' অল্প হাসলাম। কিন্তু বলতে পারলাম না ওই বুনোটা সঙ্গে আসতে চেয়েছিল, লজ্জা করছিল ওটাকে সঙ্গে করে এখানে আসতে। বললাম, 'শরীরটা খারাপ ছিল, তাই আসা হয়নি।'

'যত সব বাজে ওজর, ইস্ কী মিথ্যা কথাই না বলতে পার তোমরা বালিগঞ্জের ছেলেরা!'

'বিশ্বাস কর!'

'মোটেই বিশ্বাস করি না তোমার কথা।' ঠোঁট ফোলাল ও, ভুরু কোঁচকালো। 'নিশ্চয় তুমি আর কারো সঙ্গে প্রেম করছ।'

'আর কে, আবার কে!' হাসতে গিয়ে অবাক হয়ে আমি ওর ফোলা ঠোঁট কোঁচকানো ভুরু জোড়া দেখলাম।

'তা কত মানুষ থাকতে পারে।' আকাশের দিকে চোখ ঘোরালো ও। 'নন্তুর বোন হতে পারে, পিণ্টুর ছোট পিসি হতে পারে।'

'মোটেই না, তোমার গা ছুঁয়ে বলছি, ওদের দিকে তাকাতে আমার ঘেন্না করে।' ও দেখতে পায় এমন করে ঘাসের ওপর থুথু ফেললাম। 'নন্তুর বোনটাকে দেখলে আমার শাকচুন্নির কথা মনে হয়, পিণ্টুর ছোট পিসিকে মনে হয় পেত্নী একটা।'

এবার ও ঘাসের দিকে তাকায়, দুই ঠোঁটের মাঝখানে হাসির রেখা জাগল।

'তোমরা বালিগঞ্জের মেয়েরা এমন ভুল বোঝাবুঝি কর—সত্যি দুঃখ হয়।' ওর হাত ধরলাম, এবার হাত ছাড়াল না ও।

আমি হাসলাম।

'আসলে আমার অসুখ করেনি, বুঝলে, ওই যে নারকেল গাছের ছায়ায় উল্লুকটা বসে আছে, ওটার জন্য আসা হয়নি—দুটো রবিবার নষ্ট হল।'

'কে ও!' রুবি নারিকেল ছায়ার দিকে চোখ ফেরায়।

'সোদপুরের ছেলে। মা বলে, আমার মাসতুত ভাই—কিন্তু আমি ভাই বলে স্বীকার করি না।'

কিন্তু রুবি একটু বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকে, তারপর আস্তে আস্তে চোখ ফেরায়।

'রংটা খুব ফর্সা, কেমন না?'

'ওই ফ্যাসফেসে রংই একটা আছে—আর কিছু নেই।'

'উঁচুলম্বা আছে ছেলেটা।'

'ওই মাথায় তালগাছের মতন লম্বা হয়েছে—ভেতরে কিছু নেই।'

'কেন!' ছোট একটা ঢোক গিলল রুবি।

'বোকা—একেবারে বোকা।' আবার ঘাসের ওপর থুথু ফেললাম আমি। নারিকেল গাছের ছায়ার দিকে চোখ ফিরিয়ে রুবি আবার একটু সময় কী ভাবে।

'লেখা পড়া জানে না?'

'সেভেন পর্যন্ত বিদ্যা।' অল্প হাসলাম। 'হয়তো তা-ও না, বলে বটে।'

'একবার কাছে ডাক না।' রুবি আর একটা ছোট ঢোক গিলল।

'কি হবে কাছে ডেকে। ভয়ংকর বুনো। কথা বলে সুখ পাবে নাকি ওর সঙ্গে।' আমি নাক কোঁচকালাম। 'সদ্য পাড়া গাঁ থেকে এসেছে। যখন আমাদের বাড়িতে এসে উঠল তখন তুমি যদি চেহারাটা দেখতে। এই লম্বা চুল মাথায়, থুতনিতে দাড়ির জঙ্গল, কী নোংরা বা বেশভূষা! তবু তো আমাদের এখানে থেকে থেকে কদিনে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকতে শিখেছে।'

'জলের দিকে তাকিয়ে আছে।' রুবি অল্প হাসল।

'হুঁ, পদ্মফুল দেখছে। দেখছ না কেমন হাবার মতন একদিকে তাকিয়ে আছে।' নীচু গলায় হাসলাম। 'তুমি যে একটি মেয়ে—আমি যে তোমার সঙ্গে কথা বলছি, দেখতে পাচ্ছে, অথচ এদিকে তাকাচ্ছে না। অর্থাৎ মেয়েটেয়ে সম্পর্কে কোনো জ্ঞানই তার নেই, সেসব কোনো বোধই ঈশ্বর তার ভিতর দেয়নি। হাঁ করে তাকিয়ে জল আর জলের পদ্ম দেখছে তো দেখছেই।'

'সরল—সাদাসিধা খুব, কেমন না?'

'গরু—গাধাও বলতে পার।' রুবির চোখের ভিতর তাকালাম। 'কাজেই এখানে, তোমার ও আমার মধ্যে ওটাকে আনতে পেরেছি। কেননা, মাথায় কিস্সু নেই যার তাকে দিয়ে ভয়ও নেই—গোড়ায় ভয় করছিলাম সঙ্গে আনতে। তাই তো দুটো রবিবার আসা হল না।'

রুবি লম্বা মতন একটা নিশ্বাস ফেলল। চোখের পালক ঘাসের দিকে নেমে গেল ওর। একটু চুপ থেকে আমি আবার হাসলাম।

'অবিশ্যি আমার সঙ্গে থেকে একটু একটু শহুরে হতে শিখছে—ঐ দেখে দেখে যেটুকু অনুকরণ করার—তার বেশি না, নিজে থেকে কিছু করবার বুঝবার ক্ষমতাই ঈশ্বর তাকে দেয়নি।'

'কি শিখেছে শুনি!' রুবি হাসল না।

'আমরা বালিগঞ্জের ছেলেরা কী করি কেমন করে থাকি তুমি কি জান না। এই ধর যেমন রোজ গায়ে সাবান মাখা। আমার সঙ্গে এক বিছানায় শোয়। সাবান মেখে স্নান না

করলে আমি আমার বিছানায় ওকে শুতে দেব নাকি। আমি একদিন অন্তর শেভ করি—বলে কয়ে ওটাও ওকে অভ্যাস করিয়েছি। রামছাগলের মতন মুখ করে রাখলে আমি আমার ঘরে ঢুকতে দিতাম না ওকে।'

'আর?' রুবি এবার মুচকি হাসল।

'আমি স্মোক করি তুমি জান, দেখাদেখি একটু আধটু সিগারেট টানে এখন বোকাটা। আমি সিনেমার কাগজ রাখি তুমি জান। আমার দেখাদেখি সেগুলো নাড়াচাড়া করে মাঝে মাঝে, সুন্দর মেয়ের মুখ থাকলে ছবিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে।'

'তবে আর কি, তবে তো একরকম পাকিয়ে এনেছ।' রুবি হঠাৎ যেন কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

'ধেৎ—ও আবার পাকবে কি, পাকতে যাওয়ার জন্যও বুদ্ধি থাকা চাই; ওই তো বললাম, যেটুকু দেখছে সেটুকুই করছে—তার বেশি না। যেমন একটা বানরকে সিগারেট খাওয়া শেখালে সিগারেট খাবে এ-ও তেম্নি।'

'ইস্—ভীষণ বাড়িয়ে বলছ তুমি তোমার ওই মাসতুত ভাই সম্পর্কে।' রুবি আবার আকাশের দিকে চোখ তুলল, কেমন যেন অস্বস্তিবোধ করছে ও—চেহারা দেখে বুঝলাম।

'মোটেই না।' আমারও খারাপ লাগল বোকাকে বোকা স্বীকার করে নিতে রুবির আটকাচ্ছে কেন। 'তুমি বললে বিশ্বাস করবে? তোমার সব কটা চিঠি ওই গাড়লটা পড়েছে, আমিই পড়তে দিয়েছি—'

'মাইরি?' চমকে উঠল ও, চোখের পাতা দুটো কেঁপে উঠল।

'তাতে কি।' ব্যাপারটাকে সহজ করে দিতে আমি হাল্কা গলায় হাসলাম। 'ওই পড়াই সার—একটা চিঠি পড়ে তা থেকে কোন আইডিয়া করে নেওয়ার ক্ষমতা ভগবান ওকে দিয়েছে নাকি। যখন পড়ল, তখন পড়ল, যেমন সিনেমার কাগজ উল্টে একটা সুন্দর মেয়ের ছবি যখন দেখল—দেখল, ব্যস্ তারপর এই নিয়ে কিছু ভাবা বা চিন্তা করা ওই অজবুকটার কাছ থেকে তুমি আশা করতে পার না।'

কিন্তু তবু রুবির দুশ্চিন্তার ভাব কাটছে না।

আমি আর এক দফা হাসলাম।

'যদি তাই হত তো চিঠি পড়া শেষ করে আমায় নিশ্চয় এক আধবার সে জিজ্ঞেস করত, কার চিঠি কে লিখেছে বা কেন এত মিষ্টি মিষ্টি কথা লেখে—চিঠিতে আমার বা তোমার নামধাম নেই যখন।'

'হ্যাঁ, তা-ও বটে।' এবার একটু খুশি হল ও। আমার চোখের দিকে তাকাল।

'ডাকব কাছে? তুমি কথা বলে দেখবে?' আবার আমি নাকের আগাটা কোঁচকালাম। 'তখন বুঝবে কেমন বুনো জংলী মার ওই সোদপুরের বোনের ছেলে।

রুবি অস্পষ্টভাবে ঘাড় কাত করল।

'এই গণেশ।'

গণেশ চমকে উঠে চোখ ফেরাল। জল দেখা শেষ করে এখন বুঝি ওধারের বাগানের পেয়ারা আর কামরাঙ্গা গাছ কটা দেখছিল গুনছিল।

'ইদিকে আয়।' হাত তুলে ডাকলাম।

ছ ফুট লম্বা শরীর নিয়ে হাঁদারাম উঠে দাঁড়াল। কাছে ডেকেছি বলে বেজায় খুশি। আমি ঈশ্বরকে ডাকছিলাম রুবির সামনে না বাতাসার মতন গোল মাথার দাঁতগুলি বার

করে দিয়ে বুনোটা হাসতে আরম্ভ করে। কিন্তু ঈশ্বর আমার ডাক শুনবে কেন, যার যেমন স্বভাব গড়ে দিয়েছে—দু হাত দূরে থাকতে সব কটা দাঁত সে মেলে ধরল। তা-ও যদি শব্দ করে হাসত অজবুকটা। কাঠালের কোয়ার মতন এতগুলি দাঁত বার করে চুপ করে হাসতে থাকলে যে-কেউ তাকে ইডিয়ট ছাড়া আর কিছু মনে করবে না, করতে পারে না। অবশ্য রুবি চুপ করে ছিল। কিন্তু ওর চোখ মুখের অবস্থা কেমন হল আমি দেখিনি। আমার লজ্জা করছিল তখন রুবির দিকে তাকাতে; ঘাসের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। অবস্থাটা একটু সয়ে আসতে কটমট করে আমি গণেশের দিকে তাকালাম। যেন আমার এই তাকানোর অর্থ সে বুঝল। দাঁতের সারি বুজিয়ে ফেলল। রুবি একদৃষ্টে গণেশকে দেখছিল, ওর চেহারার কোনো পরিবর্তন বোঝা গেল না। কেবল হাত তুলে খোঁপাটা ঠিক করছিল।

'গণেশ চমৎকার সাঁতার কাটতে জানে।' বললাম রুবিকে।

'তাই নাকি।' আমার দিকে চোখ ফেরাল ও।

'যদি তুমি চাও তো ওই সুন্দর পদ্মফুলটা সে তোমাকে তুলে এনে দিতে পারে। কেমন পারবি না, গণেশ?' আবার সে দাঁত বার করছিল, কিন্তু আমি চোখের ইসারায় ধমক দিতে সেগুলো আর বার করতে সাহস পেল না, ঠোঁট বোজা রেখে গণেশ হেসে ঘাড় কাত করল।

'নীচে ইজের আছে না তোর?'

'আছে।'

'তবে ওই ঝোপের পাশে গিয়ে পা'জামাটা খুলে আয়।'

কথা না কয়ে গণেশ কেয়াফুলের বড় ঝোপটার ওপাশে ছুটে গেল। রুবির দিকে তাকিয়ে হাসলাম।

'আমি যা বলব তাই শুনবে। বুদ্ধি না থাকায় একটা মস্ত সুবিধে। পোষা কুকুরের মতন, ওকে দিয়ে আমি যা ইচ্ছা করাতে পারি।'

রুবি কথা বলছিল না। কেয়ার ঝোপের দিকে ওর চোখ। গণেশ ঝোপের ওপাশ থেকে বেরিয়ে এল। বুঝলাম ওটা বাবার পুরনো ইজের—দু জায়গায় ফুটো হয়ে গেছে; তাল গাছের গুঁড়ির মতন ইয়া লম্বা দুটো পা, তার ওপর চুলে ভর্তি—আমার কেমন ঘেন্না করছিল গাড়লটার দিকে তাকাতে, তবু এতক্ষণ পায়জামা পাঞ্জাবিতে একরকম লাগছিল, এখন বনের পশু ছাড়া কিছু কল্পনা করা যায় ওকে? আর ঐ অবস্থায় রুবির সামনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে আমি ধমক লাগালাম।

'এখানে এলি কেন, জলে নেমে পড়—ফুলটা তুলে আন।'

'বোটা শুদ্ধ তুলে আনবে।' রুবি বলল, রুবি এই প্রথম বুনোটার সঙ্গে কথা বলল। বস্তুত তাতে তার একটু বেশি খুশি হবার কথা, কিন্তু তৎক্ষণাৎ জলের দিকে ছুটে গেল বলে চেহারাটা দেখতে পেলাম না। আমার মনে হয় না একটি মেয়ের মুখে একথা শোনার পরও গণেশের চেহারার খুব একটা পরিবর্তন ঘটেছিল—কেননা, ফুলটাই এখানে তার লক্ষ্য, ওটা এনে কোনো মেয়ের হাতে তুলে দেবার মধ্যে যে উত্তেজনা—একটা অন্য ভাব থাকতে পারে তা ভেবে দেখার মতন মগজ তাকে দেয়নি ঈশ্বর।

'এসো আমরা জলের কাছে যাই।' রুবি বলল। রুবির হাত ধরে আমি দীঘির দিকে এগোই। তখন রৌদ্রের কমলা রং ধরেছে। জলে নেমে এত জোরে গোঁয়োটা সাঁতার কাটছে, হাত পা ছুঁড়ছে যে ঈষৎ লাল হয়ে আসা মেঘের ছায়া, নীল আকাশ, নারিকেল

গাছের সুন্দর ছবিগুলি ভেঙেচুরে কোথায় যেন মিলিয়ে গেল। সবটা দীঘির জল তোলপাড় করে একটা জানোয়ার সাঁই সাঁই করে পদ্মবনের দিকে ছুটেছে। দৃশ্যটা কেমন অস্বস্তিকর লাগছিল, অথচ রুবির জন্য ডাঁট শুদ্ধ পদ্ম ফুল ছিঁড়ে আনতেই হবে। আড়চোখে রুবিকে দেখলাম, দৃশ্যটা তার ভাল লাগল কি খারাপ লাগল বোঝা গেল না। মুখের রেখার কোনো পরিবর্তন ছিল না। চোখের কালো লম্বা পালকগুলি স্থির করে ধরে রেখে ও জল দেখছিল।

ফুল নিয়ে গণেশ ফিরে এল। কোমর জলে দাঁড়াল। রুবি হাত বাড়াল ফুলটা ধরতে।

'না', আমি বাধা দিলাম, 'তুই আর একটু কাছে উঠে আয়, গণেশ।'

আমার কথামত সে তীরের কাছে উঠে এল।

'ওর খোঁপায় গুঁজে দে পদ্মটা।'

রুবি চমকে উঠল, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসল। আমি আদেশ করলাম, 'দে, সুন্দর করে গুঁজে দে ওটা ওর চুলে।' গম্ভীর হয়ে গণেশ দাঁতগুলি বার করতে চেয়েছিল, আমার চোখের ধমক খেয়ে নিজেকে সংশোধন করল। রুবি ঘাড় নোয়াল! গণেশ ওর খোঁপার চুলের ভিতর ফুলটা আটকে দিল। খোঁপাটা একটু নড়ে গেল। রুবি হাত দিয়ে ওটা ঠিক করতে চেয়েছিল, কিন্তু দেখা গেল বাঘের থাবার মতন বিশাল দুটো হাতের তেলো দিয়ে চেপেচুপে গণেশই ওটা ঠিক করে দিয়েছে। রুবি একটু লাল হয়ে উঠল।

'যা, আর একটা ফুল নিয়ে আয়।'

বলা মাত্র পশুর মতন ঝাঁপিয়ে গণেশ জলে পড়ল।

'ইস্, এমন লজ্জা করছিল আমার।' রুবি বলল।

'কেন, কাকে লজ্জা', আমি হাসলাম, 'ওর মাথায় কিছু আছে নাকি; তোমার চুলে গুঁজে দিচ্ছিল বলে অন্যকোনরকম ধারণা তার মনে এসেছিল, তুমি আশা করতে পার না —যদি ওই বোকাটাকে দিয়ে তোমার লজ্জা করে তবে একটা গাছকে দিয়েও তোমার লজ্জা পাওয়া উচিত।'

রুবি ঠোঁট ফাঁক করে হাসল।

'আহা, তা হলেও তো পুরুষ।'

'তার সে খেয়ালই নেই সে একটা পুরুষ, আর—আর তুমি এমন ফুটফুটে চেহারার একটি নরম মেয়ে।'

রুবি ঢোক গিলল, চুপ করে রইল।

'বরং আমার ভয় হচ্ছিল বুনোটার হাতের নখগুলির জন্য, বাঘের নখের মতন এত বড় এক একটা নখ; যখন তোমার খোঁপা ঠিক করে দিচ্ছিল ঘাড়ের নরম চামড়ায় ওই নখের আঁচড় না লাগে, রক্ত না বেরোয়।'

'না, কিছু হয়নি।' রুবি নরম গলায় হাসল ও হাত দিয়ে নিজের ঘাড় কাঁধটা ছুঁয়ে দেখল। গণেশ ততক্ষণে সাঁতার কেটে পদ্মবনের কাছাকাছি চলে গেছে।

'তুমি ফুলটা গুঁজে দিলে না কেন?' রুবি প্রশ্ন করল।

ঘাড় কাত করে হাসলাম।

'আমি তো অনেক গুঁজেছি—তোমার খোঁপায় কম ফুল গুঁজে দিয়েছি! আজ

বুনোটাকে দিয়ে কাজটা করালাম।'

'আর একটু শহুরে হতে শেখাচ্ছ বুঝি ওকে?'

'হ্যাঁ, তা-ও বলতে পার।' অল্প শব্দ করে হাসলাম, 'বা বলতে পার মজা দেখছিলাম, খেলছিলাম, একটা পশুকে নিয়ে খেলতে তোমার ভাল লাগে না? কেমন করে ও তোমার খোঁপাটা হাটকায় মাথাটা দু হাতে চেপে ধরে?'

রুবি আর কথা বলল না, একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলল।

গণেশ পদ্ম নিয়ে ফিরে এল।

রুবি আবার হাত বাড়াল। আমি বাধা দিলাম না। গণেশ ওর হাতে ফুলটা তুলে দিতে রুবি সেটা তাড়াতাড়ি ব্লাউজের ফাঁকে বুকের ওপর গুঁজে রাখল।

'আয়, এইবেলা জল থেকে উঠে আয়।' গম্ভীর হয়ে গণেশকে ডাকতে সে তীরে উঠে এল। যেন আমি তার ওই অবস্থায়—ভিজা ইজের পরা ভিজা গা-মাথা নিয়ে গাড়লের মূর্তি হয়ে রুবির সামনে দাঁড়িয়ে থাকা একেবারেই পছন্দ করব না অনুমান করে কাপড় বদলাতে সে ঝোপের দিকে ছুটে যাচ্ছিল, আমি বাধা দিলাম।

'উঁহু, আরো কাজ আছে, ফল পাড়তে হবে—পাজামা পরে গাছে চড়া সুবিধা হবে না।' রুবির দিকে ঘাড় ফেরালাম, 'কটা পাকা পেয়ারা পেড়ে দিক তোমাকে?'

রুবি কিন্তু খুশি হল কিনা বুঝলাম না, কেবল ছোট ঘাড়টা একটু কাত করল ও। আমরা বাগানের দিকে চললাম। গণেশ আগে, আমি ও রুবি পিছনে। গাছের ছায়া তখন লম্বা হয়ে গেছে, রোদের রং আরো গাঢ় হয়েছে, ঝিঁঝি ডাকছিল।

গণেশকে গাছে তুলে দিয়ে দুজনে নীচে দাঁড়ালাম। দেখলাম, এখন যেন রুবির উৎসাহ একটু একটু করে বাড়তে আরম্ভ করেছে। আঙুল দিয়ে গাছের ডাশা পেয়ারাগুলি ও দেখিয়ে দেয়, আর, এক ডাল থেকে আর এক ডালে ঝুলে পড়ে গণেশ সেগুলি ছিঁড়ে ছিঁড়ে নীচে ছুঁড়ে ফেলে।

'এখন অনায়াসে একটা বানর কি শিম্পাঞ্জী বলে ধরে নিতে পার তুমি গণেশকে; দ্যাখ ঐ মগডাল থেকে লম্বা হাত বাড়িয়ে কেমন করে পেয়ারা ছিঁড়ছে।' রুবি আমার সঙ্গে হাসল না, পেয়ারা কুড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। টুপ টাপ করে গাছ থেকে ক্রমাগত পেয়ারা পড়ছে মাটিতে। একটা পেয়ারা ওর খোঁপার ওপর পড়ল, পদ্মের দুটো পাপড়ি খসে পড়ল পেয়ারার বাড়ি লেগে, একটা এসে পড়ল রুবির বুকের ঠিক মাঝখানে। যদি আমি এমন করতাম, গাছে চড়তে না জানি, যদি মাটিতে দাঁড়িয়ে থেকেও এভাবে ওর চুল কি বুকের ওপর পেয়ারা ছুঁড়ে ফেলতাম রুবি খিলখিল করে হেসে সারা হত। কিন্তু এখন ও হাসছে না, কেননা ইচ্ছা করে বা দুষ্টামী করে কেউ তার মাথা বা বুক লক্ষ্য করে পেয়ারা ছুঁড়ে মারছে না। গাছের ওপর যে আছে তার সেরকম দুষ্টামী করার, ছেলেমানুষী খেলা খেলবার বুদ্ধিই নেই রুবি এটুকু বুঝে ফেলেছে, তাই না ও এত গম্ভীর। রুবির জন্য আমার কষ্ট হল।

'কেবল কুড়াচ্ছ, একটা খাও না, খেয়ে দ্যাখ কেমন মিষ্টি।' একটা পেয়ারা তুলে আমি রুবির দিকে বাড়িয়ে দিলাম, এতক্ষণ পর ও হাসল।

'তুমি খাও, তুমি বসে বসে পেয়ারা খাও, আমি কুড়িয়ে দিচ্ছি।' রুবি এক ডজন পেয়ারা আমার সামনে ঘাসের ওপর জড়ো করে রাখল। খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ ঘাসের ওপর চেপে বসলাম। রুবির দেওয়া একটা পেয়ারায় কামড় দিয়ে মনে হল অমৃত। ও ঘামছিল।

ছুটে ছুটে পেয়ারা কুড়াচ্ছে বলে খোঁপাটা আবার ঢিলে হয়ে গেছে। আমার ইচ্ছা করছিল হাত দিয়ে চেপে খোঁপাটা জায়গামতন বসিয়ে দিই। আর সেই সঙ্গে আমার হাতের নখগুলির ওপর নজর পড়ল। কত পরিচ্ছন্ন মসৃণ। রুবির গলা বা ঘাড়ের চামড়ায় এই নখ লাগলে ও বুঝতে পারবে না—টেরই পাবে না—এমন পালিশ করে কাটা; আর সেই তুলনায় গাছের বুনোটার প্রত্যেকটা আঙুলের নখের কী বিশ্রী বীভৎস চেহারা। বলতে কি গণেশের নখগুলির কথা মনে পড়তে মুখের পেয়ারাটা পর্যন্ত বিস্বাদ হয়ে গেল। ইচ্ছা করছিল রুবিকেও আবার কথাটা মনে করিয়ে দিয়ে দুজনে একসঙ্গে হাসি।

হঠাৎ চোখে পড়ল পেয়ারা কুড়াতে কুড়াতে রুবি একটু দূরে সরে গেছে। গাছের গায়ে গাছ, বুঝলাম একটা গাছের ডাল বেয়ে গাড়লটা আর একটা গাছে চলে গেছে। 'আর পেয়ারা দিয়ে কী হবে, অনেক হয়েছে,' ডেকে বলতে ইচ্ছা করছিল। কিন্তু চুপ করে রইলাম। রুবি ফলগুলি কুড়িয়ে আনন্দ পাচ্ছিল, ওকে বাধা দিলাম না।

অগত্যা সিগারেট ধরালাম। পেয়ারা কত খাওয়া যায়! দুটো খেয়ে আমার ঢেকুর উঠছিল। সিগারেট ধরিয়ে টান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গণেশও গাছ থেকে নেমে পড়ল।

'কি হল, হয়ে গেল?' আমি হাসলাম, রুবির দিকে তাকিয়ে হাসলাম, ও আমার কাছে চলে এল। বোকাটা দূরে গাছতলায় দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। ঐ পোষাক নিয়ে আমার সামনে হুট করে আসতে সাহস পাচ্ছে না। সত্যি, ঈশ্বর এই বয়সেই মার বোনের ছেলেকে কী প্রকাণ্ড একটা শরীর তৈরী করে দিয়েছে—অসুরের মতন কোমর হাত পা ও বুকের চেহারা; কোমরে হাত রেখে পেয়ারা তলায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আমার আদেশের অপেক্ষা করছে, আমি ডাকলে তবে কাছে আসবে, যতক্ষণ ডাকব না আসবে না। কথাটা চিন্তা করে এত ভাল লাগছিল। রুবিও বুঝতে পেরেছে, অতবড় একটা শরীর ঐ বুনোটার, অথচ তুলনায় কত ছোটখাট একটি মানুষ হয়ে আমি তাকে হাতের মুঠোয় রেখে দিয়েছি।

আঁচলের পেয়ারাগুলি রুবি আমার সামনে ঘাসের ওপর রাখল। পেয়ারার পাহাড় জমে গেল। অনেকক্ষণ ছুটোছুটি করার দরুন ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল ওর।

'একটু জিরিয়ে নাও এখানে বসে।' বলতে চেয়েছিলাম, তার আগেই রুবি সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'চলি।'

'কোথায় আবার।' আমি ঢোক গিললাম। ও অল্প হাসল।

'কামরাঙ্গাগুলো পেকে আছে কদিন ধরে—সেগুলো পেড়ে দেবে।'

খুশি হয়ে তৎক্ষণাৎ ঘাড় কাত করলাম।

'হুঁ গাড়লটাকে দিয়ে সব কটা পাড়িয়ে নাও।' আস্তে বললাম, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে হাঁক দিয়ে গণেশকে বললাম, 'এই গণেশ, এখন কামরাঙ্গা গাছে উঠতে হবে।'

গণেশ সঙ্গে সঙ্গে ঘাড় কাত করল। রুবির চোখের দিকে তাকিয়ে আমি ঠোঁট টিপে হাসলাম। যদিও এই হাসিটাকে 'মেয়েলী হাসি' বলে ও মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে, এখন করল না; এখন ও পাল্টা ঠোঁট টিপে হাসল। এখানে আমার হাসির অর্থ রুবি চট্ করে বুঝে নিয়েছে। আর দাঁড়ায় না ও, কামরাঙ্গা গাছের দিকে ছুটে গেল। গণেশ আগেই চলে গেছে।

যেন আর একটা কি কথা আমি বলতে চেয়েছিলাম, কিন্তু ঝাঁকড়া মাথার বাতাবী লেবু গাছটার জন্য রুবিকে দেখা গেল না।

আমি নিশ্চিন্তমনে হাতের সিগারেটটা টানতে লাগলাম। রোদটা একেবারে মজে

গেছে। ঝিঁঝির ডাক ক্রমে খরতর হয়ে উঠছে। সুন্দর একটি হাওয়া দিতে আরম্ভ করেছে বলে বাতাবীলেবুর পাতাগুলি থেকে থেকে দুলছিল। দুজনকে দেখতে পাওয়া যাচ্ছিল না, কিন্তু রুবির গলা শুনছিলাম।

ওর গলার স্বর শুনে আমি বুঝতে পারছিলাম, উৎসাহ বেড়ে গেছে। 'ওই যে, আর একটা, আর একটা, পেকে টুসটুসে হয়ে আছে, কেমন হলদে হয়ে আছে ঐ কামরাঙ্গাটা।' চেঁচিয়ে বলছিল ও। একটা পাখি ডাকছিল। কিন্তু পাখির স্বরের চেয়েও রুবির গলা যে অনেক বেশি মিষ্টি সিগারেট টানতে টানতে আমি তা অনুভব করছিলাম। একটা কথা মনে পড়ে যাওয়ায় হাসলাম। কেননা রুবির ছোট্ট একটা খিলখিল হাসি ইতিমধ্যে আমার কানে এসেছে। অর্থাৎ এতক্ষণ পর, অনেকক্ষণ চেষ্টার পর রুবি বুনোটাকে নিয়ে খেলতে পারছে; রুবি নিশ্চয় হাসি দিয়ে তাকানো দিয়ে বোকারাম গণেশের মধ্যে দুষ্টামী বুদ্ধি জাগাতে পেরেছে; বোধ করি ইচ্ছা করে গণেশ ওঁর খোঁপা লক্ষ্য করে এক আধটা কামরাঙ্গা ছুড়ে ফেলতে পারে; তাই রুবির হাসি।

জড়বুদ্ধির একটা মানুষকে আমি বাধ্য করে ফেলেছি, হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছি, তাই আমার আনন্দের অবধি ছিল না; এখন রুবিও সেটা পারছে, একটা জানোয়ারকে বশ করে ফেলেছে, তাকে নিয়ে খেলছে। রুবির সঙ্গে এই নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে চিন্তা করে আমি তখনি উঠলাম না, চুপ করে বসে সিগারেট টানতে লাগলাম, যেন আশা করছিলাম রুবির খিলখিল হাসিটা আর একবার শুনব।

একটা দমকা হাওয়া উঠল, উঠল আবার সঙ্গে সঙ্গে থেমেও গেল। আমি একটু নড়েচড়ে বসলাম। কেননা একটু সময়ের জন্য বাতাসটা কেমন যেন অস্বস্তি জাগিয়ে দিয়ে গেল। বাতাস বন্ধ হবার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকটা যেন বেশি চুপচাপ হয়ে গেল। গাছের পাতা আর নড়ছে না। রুবির গলা শুনছি না, বা ওধারে গাছের ডালে উঠে কেউ ফলটল পাড়ছে সেরকম কিছু আভাস পাচ্ছি না! পাতার খসখস কি ছোটখাট ডাল ভাঙ্গার শব্দ—কিছু না। সব মরে আছে স্থির হয়ে আছে। ঝিঁঝির ডাকটাও থেমে আছে। বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল।

উঠে আস্তে আস্তে বাতাবীলেবু গাছটার দিকে এগোলাম। এক সময় লেবু গাছ পিছনে ফেলে, জঙ্গল মতন জায়গাটা, যেখানে সারি সারি তিনটে কামরাঙ্গা গাছ, সেখানে চলে গেলাম। কাউকে দেখলাম না। অতি সূক্ষ্ম আওয়াজ করে কি একটা পোকা কোন গাছের শুকনো ডাল না শিকড় যেন কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। কেমন ভয় হল মনে। বস্তুত সেখানে কোনো মানুষ চুপ করে বসে বা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে বিশ্বাস করতে বাধছিল, এত নির্জন, এমন নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল বাগানের ভিতরটা। কামরাঙ্গা গাছ দেখা শেষ করে আমি লিচু গাছের কাছে গেলাম। লিচুর সময় না, কাজেই জায়গাটা আরো শূন্য স্তব্ধ মনে হল। দুবার আমি রুবির নাম ধরে ডাকলাম, তিনবার গণেশকে ডাকলাম। কোনো সাড়া নেই। বা বলা যায় আমার ডাকের উত্তরে আতাবনের ওদিকটা থেকে বাদুড়ের পাখার ঝাপ্টা ভেসে এল। আতাজঙ্গলের দিকে যাব কি, বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে ততক্ষণে, সাপের হিসহিস শব্দের মতন একটা শব্দও ভেসে আসছিল ওদিক থেকে। তা ছাড়া আতা পাকতে আরম্ভ করেনি যে ওরা ওখানে যাবে। আমি নিশ্চিত ছিলাম ওরা সেখানে নেই; আবার পেয়ারা তলায় ফিরে এলাম, দীঘির ধারে ছুটে এলাম। জলের বুক কালো হয়ে গেছে। অন্যদিন এসময়টায় তারার ঝিকিমিকি ছবি ধরে রাখে

দীঘিটা আরসি হয়ে—আজ সেরকম কোনো ছবি ছিল না, অথবা ছিল, আমিই দেখিনি, দেখার চোখ ছিল না; চোখ দুটো কেমন ঝাপসা হয়ে উঠল একটু সময়ের মধ্যে। ঝাপসা দৃষ্টি নিয়ে যে-কথাটা ভাবতে ভাবতে আমি বাগান থেকে সেদিন বেরিয়ে এসেছিলাম, তা ঠিকই হয়েছিল। আর দশজনের ভাবনার সঙ্গে আমার ভাবনা মিলে গিয়ে তা চিরকালের সত্য হয়ে রইল।

কিন্তু মাঝে মাঝে আমার মনে হত, ওরা বাগানেই ছিল, বাগান থেকে বেরিয়ে কোথাও যায়নি। সেই সন্ধ্যার ছবিটা আমার মনে পড়ত। যাকে বুনো বলতাম গাড়ল বলতাম, সে আর মানুষের আকৃতি নিয়ে ছিল না, বাগানের একটা গাছ হয়ে অরণ্যের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল, আর সেই অরণ্য আমাদের বালিগঞ্জের ঝকমকে মেয়ে রুবিকে জীর্ণ করে ফেলেছিল।

সুরাটে ইংরাজ কুঠি

জন ওভিংটন

[জন ওভিংটন নামক জনৈক পাদ্রী ১৬৮৯ খৃষ্টাব্দে সুরাটে ইংরাজকুঠির ধর্মযাজক নিযুক্ত হইয়া ভারতবর্ষে আসেন। ভারত তাঁহার ছয় বৎসরের অভিজ্ঞতা লইয়া লিখিত পুস্তক *A Voyage to Surat* তিন ১৬৯৬ সালে প্রকাশ করেন।

তদানন্তীন কালের তথ্যের আকর বলিয়া পুস্তকটি আজ বহুদিন হইল ঐতিহাসিকদের সমাদর লাভ করিয়া আসিতেছে। ওভিংটনের লেখার ভঙ্গী এতই সরস, তাঁহার কৌতূহল এতই বিস্তৃত, দৈনন্দিন জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি বর্ণনার ক্ষমতা এতই চিত্তাকর্ষক যে সাধারণ সাহিত্যমোদী পাঠকগণও এই পুস্তকটি আগ্রহের সহিত পড়িতে পারেন।

ওভিংটনের সরস লেখনীর গুণে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের সুরাট জীবন্তভাবে মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। একদিক হইতে এই পুস্তকটির বোধ হয় সব চেয়ে বড় মূল্য হইল যে ইহা ভারতে ইংরাজ বণিকদের আদিপর্বের প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণী। ওভিংটন যখন সুরাটে আসেন তখন ইংরাজ বণিকরা সবেমাত্র ভারতবর্ষে ঘাঁটি গাড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। এই বুদ্ধিমান ইংরাজ পাদ্রী তাঁহার দেশীয় বণিকগণের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, তাহাদের বাণিজ্যপদ্ধতি, তাহাদের রাজনীতি ইত্যাদি যে অন্তর্দৃষ্টির সহিত বিবৃত করিয়াছেন তাহার ঐতিহাসিক মূল্য অতুলনীয়। ইহা পাঠ করিলে বুঝিতে অসুবিধা হয় না যে সকল ইউরোপীয় জাতিগণের মধ্যে ইংরাজরাই কেন মুঘলদরবারের সামান্য কৃপাভিক্ষার্থী বণিকদল হইতে কালক্রমে ভারতবর্ষের একছত্র অধীশ্বর হইয়া দাঁড়াইল।

ওভিংটনের পুস্তকে সুরাট ছাড়া তাঁহার সমুদ্রযাত্রা, আফ্রিকা, আরব, বাংলা ও আরাকানের বিবরণী, গোলকোণ্ডার বিপ্লব, ভারতবর্ষ, পারস্য ও গোলকোণ্ডার মুদ্রার আলোচনা, এমন কি গুটিপোকা চাষের তথ্যাদিও রহিয়াছে।

বর্তমান প্রবন্ধটি ওভিংটনের পুস্তকের অন্তর্গত 'সুরাটে ইংরাজ কুঠির বিবরণী' নামক পরিচ্ছেদটির অনুবাদ।]

বাণিজ্যসম্পর্কিত একটি পুস্তিকা হইতে জানিতে পারা গেল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বৎসরে একুনে এক লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় করেন। এই ব্যয়াধিক্যের অবশ্য কারণ রহিয়াছে। ইংরাজ জাতির সম্মান ও ব্যবসায় অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সম্ভ্রান্ত কর্মচারীগণের শুধু ভালভাবেই নহে পরন্তু বেশ জাঁকজমকের সহিত বাস করা প্রয়োজন বোধ করেন। যে সকল ভ্রমণকারী সুরাট, মাদ্রাজের ফোর্ট সেণ্ট জর্জ, পারশ্যের অন্তর্গত গোমবোর্ণ অথবা বাংলা মুলুকে গিয়াছেন তাঁহারাই ইহা স্বচক্ষে দেখিবার সুযোগ পাইয়াছেন। প্রাচ্যদেশে এইগুলিই ইংরাজ জাতির প্রধান প্রধান বাণিজ্যের কুঠি। এই কুঠিগুলিতে কোম্পানীর এক এক জন করিয়া অধ্যক্ষ মোতায়েন আছেন। তাঁহার এবং তাঁহার অধীনস্থ কুঠিয়ালগণের মাহিনা ও অন্যান্য পাওনা বাবদ মোটা টাকা বরাদ্দের ব্যবস্থা আছে।

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ এই সকল পণ্য খরিদ করিয়া জাহাজে চালান দিবার ব্যবস্থা করেন। ইংরাজ কুঠিয়ালগণ যদি সর্বদা সজাগ ভাবে এই ব্যবসায় তদারক ও রক্ষা না করেন তাহা হইলে অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণ অতি অল্পকালের মধ্যেই তাহা দখল করিয়া লইবে। তখন তাহারা শুধু মশলা দ্বীপেরই নহে সমগ্র ভারতের ব্যবসাই একচেটিয়া করিয়া লইবে এবং

ভারতবর্ষ হইতে মশলা, রেশম, সূতীবস্ত্র, ভেষজপদার্থ, বহুমূল্য প্রস্তর এবং অন্যান্য যাবতীয় ভারতীয় পণ্য যথেচ্ছদরে ইউরোপে বিক্রয় করিবে। কিছুদিন পূর্বে একদল লোক মুঘল বাদশাহকে ইংরাজদের অপেক্ষা অধিক কর দিবার প্রস্তাব দিয়া সুরাট অঞ্চলের ব্যবসায়ের একচেটিয়া স্বত্ব করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করে। ইউরোপীয় বণিকগণ মালাবার উপকূলে ইংরাজদের অপেক্ষা অধিক দরে গোলমরিচ ক্রয় করিয়া ও দেশীয় বণিকগণকে নানাবিধ ভেট প্রদান করিয়া সেই অঞ্চলে আমাদের বাণিজ্য লণ্ডভণ্ড করিয়া দিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে। এই সকল কারণে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের কুঠি রাখা একান্ত প্রয়োজন। যদি একবার এই কুঠিগুলি উঠাইয়া লওয়া হয় তাহা হইলে ইংলণ্ড ও ভারতের মধ্যে সকলপ্রকার ব্যবসাবাণিজ্য অনতিবিলম্বে লোপ পাইবে। তখন ইউরোপীয় বণিকগণ যে কাজ ঘুষ বা নজর দ্বারা সফল করিতে পারে নাই তাহা অন্যান্য উপায়ে হাঁসিল করিবে এবং তাহাদিগের হাত এড়াইয়া ভারত হইতে কোন পণ্যদ্রব্যই ইউরোপে চালান যাইবে না। সেইজন্য আমাদের কুঠিয়ালগণের এক প্রধান কাজ হইল অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণের প্রতিটি চালের উপর কড়া নজর রাখা, তাহাদের মতলব ও উদ্দেশ্য সঠিকভাবে অনুধাবন করিয়া তাহা বানচাল করা। এই কর্তব্য সম্পাদনের জন্য মধ্যে মধ্যে মুঘল বাদশাহকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন হয়। শুধু বাদশাহকেই নহে, তাঁহার দরবারের প্রধান প্রধান আমীর-ওমরাহ এবং তাঁহার প্রিয়পাত্রগণকেও প্রয়োজনমত উপঢৌকন দিয়া তাঁহাদের সন্তুষ্টিসাধন করা দরকার যাহাতে ইংরাজ বণিকগণ তাঁহাদের অনুগ্রহ হইতে বঞ্চিত না হয়।

এই সকল কারণেই ভারতীয় ব্যবসা ও বাণিজ্যের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিগণ মনে করেন যে ব্যবসা অক্ষুন্নভাবে চালাইতে হইলে ইংরাজ কুঠিয়ালগণের যাবতীয় খরচ ছাড়াও অন্যান্য-ভাবে সাহায্য করা আবশ্যক। ভারতীয় ব্যবসায় হইতে যদি কিছু লোক ব্যক্তিগত ভাবে লাভবান হয় তাহাতে বাধা দেওয়া সমীচিন নাও হইতে পারে। কারণ, একথা স্মরণ রাখা দরকার যে অন্যান্য ইউরোপীয় ব্যবসায়ীগণের চক্রান্ত ব্যর্থ করিয়া ভারতে ইংরাজ ব্যবসায় বজায় রাখার ফলে সমগ্র ইংরাজ জাতির প্রভূত উপকার সাধিত হইতেছে। দিনেমার বাণিজ্য-পোতগুলির ন্যায় ইংরাজ জাহাজগুলিও যাহাতে উভয় জাতির শত্রু ফরাসীদের হাত এড়াইয়া নির্বিঘ্নে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা সমগ্র ইংরাজ জাতির কর্তব্য।

সুরাটে যে অট্টালিকাটিতে ইংরাজ কুঠিয়ালগণ বাস করেন তাহার মালিক স্বয়ং মুঘল বাদশাহ। সুরাটের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ অট্টালিকাটি শহরের উত্তর-পশ্চিম ভাগে অবস্থিত। ইহাতে অধ্যক্ষের একটি মহল ছাড়াও চল্লিশজন কর্মচারীর অত্যন্ত আরামের সহিত বাস করিবার বন্দোবস্ত আছে। বাড়িটির বাৎসরিক ভাড়া ৬০ পাউণ্ড। আমাদের জমিদার আওরঙজেব কিন্তু প্রায়শঃই এই অর্থ গ্রহণ করেন না। তাঁহার আদেশ অনুযায়ী এই অর্থ বাড়িটির সৌন্দর্যসাধন, মেরামতি অথবা আয়তন বৃদ্ধি করার জন্য ব্যয়িত হইয়া থাকে। গৃহটির সংলগ্ন কয়েকটি তাওয়াখানা, গুদাম, একটি পুষ্করিণী ও একটি হামাম রহিয়াছে।

কোম্পানীর পশ্চিমাঞ্চলের অধ্যক্ষ এই অট্টালিকাটিতে বাস করেন। বোম্বাইয়ের শাসন-ভার ইঁহার হস্তে ন্যস্ত। ইঁহাকে 'মাননীয়' উপাধিদ্বারা সম্মানিত করা হয়। কয়েকজন অধ্যক্ষ সুরাটে কিয়ন্দিন বাস করিয়া প্রভূত অর্থ সঞ্চয় করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৎসরে তিনশত পাউণ্ড মাহিনা ব্যতিরেকে তাঁহারা জাহাজী ব্যবসায়ী হইতে নানাপ্রকার সুযোগ-

সুবিধা পাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া সমগ্র প্রাচ্যদেশে তাঁহারা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা করিতে পারেন। এই ব্যবসায় অত্যন্ত লাভজনক। ইংরাজ জাতির ব্যক্তিগত স্বাধীনতার রীতি অনুযায়ী অধ্যক্ষ ছাড়া ছোট বড় সকল কর্মচারীকেই ইচ্ছানুসারে বাণিজ্য করিবার পূর্ণ অধিকার দেওয়া আছে। দিনেমার কুঠিয়ালগণ এই সুবিধালাভের জন্য লালায়িত, কিন্তু তাহাদের পক্ষে কোনপ্রকার ব্যক্তিগত ব্যবসায়ে লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ।

কর্মচারীদের মধ্যে অধ্যক্ষের পর মুহুরীর স্থান। তাঁহার নিম্নে ভাণ্ডারী এবং তাঁহার তলায় মুৎসুদ্দী। এই চারজনকে লইয়া কাউন্সিল গঠিত। কাউন্সিলের সভ্যগণের মধ্যে অধ্যক্ষের দুইটি ভোট। কোম্পানীর কাজকর্ম ও ব্যবসাবাণিজ্য কিভাবে চালাইতে হইবে কাউন্সিলের সভ্যগণ মন্ত্রণা করিয়া স্থির করেন। কোম্পানীর কুঠিয়ালগণের শাসন-ভারও ঐ কুঠিয়ালগণের হস্তে ন্যাস্ত।

কোম্পানীর কর্মসচিব কাউন্সিলের সভ্য নহেন, কিন্তু তিনি কাউন্সিলের মন্ত্রণার সময় উপস্থিত থাকেন এবং তাঁহাদের হুকুম তামিল করিতে সাহায্য করেন। কাউন্সিলের কোন সভ্যের পদ খালি হইলে তাঁহার দাবী সর্বাগ্রে। কোম্পানীর অন্যান্য কর্মচারীগণ তাঁহাদের পদের উচ্চতা ও কার্যকাল অনুযায়ী ক্রমে ক্রমে কাউন্সিলের সভ্য নির্বাচিত হন। অবশ্য কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে কোন কুঠিয়ালকে পুরাতন ও উচ্চপদস্থ কর্মচারী-দের টপকাইয়া কাউন্সিলের সভ্য করিয়া দিতে পারেন। কিন্তু সাধারণতঃ তাঁহারা এই ক্ষমতা ব্যবহার করেন না, কারণ প্রচলিত ব্যবস্থা সকল দিক হইতেই ন্যায্য। তাহা ছাড়া এই ব্যবস্থায় কার্যও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় এবং কোম্পানীর স্বার্থ অক্ষুন্ন থাকে।

ধর্মযাজককে সাধারণতঃ পদমর্যাদায় তৃতীয় স্থানীয় বলিয়া ধরা হয়। গোমস্তা, কেরাণী ও শিক্ষানবীশী—ইঁহারা কুঠির অন্যান্য কর্মচারী। এই সকল কর্মচারীগণকে তাঁহাদের নিজ নিজ পদে তিন বৎসর হইতে পাঁচ বৎসর কার্য করিবার পর অথবা বিলাত হইতে আসিবার সময়ে চুক্তিবদ্ধ মেয়াদ অতিবাহিত হইলে উচ্চতর পদে নিযুক্ত করা হয়। শিক্ষানবীশ প্রথমে কেরাণী এবং তৎপরে গোমস্তার পদে উন্নীত হন। পদোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কর্মচারীগণের মাহিনা বাড়ে এবং তাঁহারা অন্যান্য সুবিধালাভ করেন। বেতন ছাড়া কোম্পানী ইঁহাদের বাস ও গ্রাসাচ্ছাদনের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার বহন করেন। তাহা ছাড়া সুরাট হইতে চীন অবধি সকল দেশের সঙ্গে ইঁহাদের ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা চালাইবার অবাধ স্বাধীনতা আছে। এই ব্যবসায়ে ইঁহারা সাধারণতঃ শতকরা শতভাগ মুনাফা করিয়া থাকেন। যদি কেহ কেবলমাত্র সোনারূপার ব্যবসায় করেন তাহা হইলে লভ্যাংশ টাকায় আট আনা দাঁড়ায়। কর্মচারীগণের মধ্যে যাঁহাদের সুনাম রহিয়াছে অথচ অর্থ নাই তাঁহারা চীনদেশের সহিত কারবারের জন্য স্থানীয় বেনেদের নিকট হইতে শতকরা ২৫৲ টাকা সুদে কর্জ লইতে পারেন। জাহাজ মাল লইয়া নির্বিঘ্নে সুরাটে পৌঁছিবার পর ধারের টাকা শোধ দিতে হয় এবং যদি কোন কারণে পণ্যবাহি জাহাজ পথিমধ্যে নিমজ্জিত হয় তাহা হইলে ধার শোধের প্রয়োজন হয় না। ব্যবসায়ে লাভের পরিমাণের তারতম্য রহিয়াছে এবং তাহা স্থানের দূরত্ব ও ব্যবসায়ের সুযোগ সুবিধার উপর নির্ভর করে।

কোম্পানীর কাজ চালাইবার জন্য এবং অধ্যক্ষ ও কাউন্সিলের সভ্যগণের ফরমাইশ খাটিবার জন্য চল্লিশ পঞ্চাশজন বেতনপ্রাপ্ত ব্যক্তি নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহারা প্রতিদিন প্রাতে অধ্যক্ষের নিকট হাজিরা দিয়া তাঁহার হুকুম তামিল করে ও দৈনন্দিন কাজের ফিরিস্তি গ্রহণ করে। কাজকর্ম সারিবার পর প্রতিদিন সন্ধ্যায় তাহারা অধ্যক্ষের নিকট 'হুজুরে

হাজির' দিবার জন্য জমায়েৎ হয় এবং অধ্যক্ষ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী বিদায় দিলে তাহারা শহরে নিজ নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। এই সকল লোক ছাড়া অধ্যক্ষের ফাইফরমাস খাটিবার জন্য আরও কয়েকজন ভৃত্য নিযুক্ত থাকে। সেইরূপ মুহুরীর জন্য দুইজন এবং ধর্মযাজক ও কাউন্সিলের অন্যান্য সভ্য ও কর্মসচীবের জন্য একজন করিয়া লোক থাকে।

কোম্পানীর সুনাম ও সম্মান এবং ব্যবসায় স্বার্থ অক্ষুণ্ণ রাখাই কুঠিয়ালগণের সর্বপ্রধান কর্তব্য। সর্বনিম্নদরে মাল ক্রয় করিয়া উচ্চদরে বিক্রয় করিবার জন্য ইহারা সদা-সর্বদা সচেষ্ট।

অধ্যক্ষ ও অন্যান্য কুঠিয়ালগণ বৎসরে একবার মাহিনা পাইয়া থাকেন। মুহুরীর মাহিনা ১২০ পাউন্ড, কাউন্সিলের অন্য দুইজন সভ্যের মাহিনা ৪০ পাউন্ড। গোমস্তাগণ ১৫ পাউন্ড ও কেরাণীগণ ৭ পাউন্ড বার্ষিক মাহিনা পাইয়া থাকেন। ইহা ছাড়া কাউন্সিলের সভ্যগণ ও কর্মসচীব আরও নানাপ্রকার সুবিধা ভোগ করেন। যাহারা মাসিক বেতনভোগী তাহারা ৪৲ টাকা করিয়া পাইয়া থাকে এবং ইহারা তাহাদের সর্দারগণের অধীনে কাজ করিয়া থাকে। মাসের পয়লা হাজিরা দিয়া ইহারা প্রথমে চন্দের বন্দনা করিয়া অধ্যক্ষের নিকট ভক্তিপূর্ণভাবে আর্জি পেশ করে। অধ্যক্ষ তখন একজন কর্মচারীকে ইহাদের পাওনা মিটাইয়া দিবার আদেশ দেন।

কুঠিকর্মে নিযুক্ত বহুসংখ্যক ভারতীয় ভৃত্যগণ যাহাতে আড়তের কোন মালপত্র চুরি না করে সেইজন্য আড়তদার প্রতিদিন সন্ধ্যায় গৃহে ফিরিবার পূর্বে মালপত্রের হিসাব নেয়। যদি কোন জিনিষ পাওয়া না যায় তাহা হইলে এই ভৃত্যদিগকে কুঠি হইতে বাহির হইবার পূর্বে তল্লাশ করা হয়। কিন্তু তাহাদের সততাই আমাদের সর্বপ্রধান ভরসা, চুরি হইতে লোকসানের রক্ষাকবচ। আজ বহু বৎসরের মধ্যে ইহাদের কাহারও বিরুদ্ধে একটিও চুরির অভিযোগ হয় নাই। এই সকল ভৃত্যগণ এতই বিশ্বস্ত ও অনুগত যে যখনই অধ্যক্ষ কোন সোনাদানা বা রূপার কারবার করেন তখন সেই গোপনীয় তথ্য ইহাদের মধ্যে কয়েক-জনকে জানাইয়া দেন। সেই ভৃত্যগণ একটি পাইপয়সার বেহিসাব না করিয়া সেই কার্য নির্বিঘ্নে সুসম্পন্ন করে।

অধ্যক্ষের অনুমতি ছাড়া কোন কুঠিয়াল কুঠি ছাড়িয়া বাহির হইতে পারেন না অথবা বাহিরে থাকিতে পারেন না বা দেশ ছাড়িয়া যাইতে পারেন না। কুঠির ফটকে দিবারাত্র পাহারাদার মোতায়েন থাকে যাহাতে কোন সন্দেহজনক ব্যক্তি কুঠির অভ্যন্তরে প্রবেশ না করিতে পারে। কিন্তু প্রতি বৃহস্পতিবার রাত্রে পাহারাদার ছুটি লইয়া গৃহে যাইবার জন্য আর্জি করে। কারণ সে মুসলমান ও বিবাহিত এবং তাহার মতে সে যদি তাহার স্ত্রীর সহিত সপ্তাহে অন্ততঃ একবার দেখা না করে তাহা হইলে দাম্পত্য কলহ ঘটা অস্বাভাবিক নহে। সুরাটের রাস্তায় ভিখারীগণ সাধারণতঃ "জিমরুত সাহাব, জিমরুত সাহাব" বলিয়া ভিক্ষা প্রার্থনা করে। বৃহস্পতিবার রাত্রে কিন্তু তাহারা বলে, "মহাশয়, আজ বৃহস্পতিবার, আজ বিশেষ করিয়া আপনার কৃপাভিক্ষা করি। আজ আপনি দয়া করিলে আমি আমার স্ত্রীর মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ হইব।"

প্রতিদিন অধ্যক্ষ ও কুঠিয়ালগণ একত্রে বসিয়া আহার করেন। কুঠিয়ালগণের পদ-মর্যাদানুযায়ী ভোজনের টেবিলে বসিবার স্থান নির্দিষ্ট রহিয়াছে। সুরাট ও পারিপার্শ্বিক অঞ্চল হইতে সর্বোৎকৃষ্ট মাংস, সিরাজের মদ্য ও আরক মদ্য ইত্যাদি সুখাদ্য ও সুপেয় প্রচুর পরিমাণে পরিবেশিত হয়। খাদ্য ও পানীয়ের জন্য প্রতিবৎসর সহস্র সহস্র মুদ্রা

ব্যয় করা হয়। দৈনন্দিন ভোজনের ব্যবস্থা বেশ রাজকীয়। দুই তিনজন কসাই ও দুই তিনজন খানসামা মাংস সরবরাহ ও রন্ধনের জন্য নিয়োজিত থাকে। কুঠিয়ালগণ অবশ্য ইউরোপীয় মদ্য ও বিলাতী বিয়ারই সবচেয়ে বেশী পছন্দ করেন কারণ যাবজ্জীবন তাঁহারা এইগুলিই পান করিতে অভ্যস্ত। সেইজন্য চড়াদাম হইলেও ইঁহারা এই সকল পানীয় ক্রয় করিয়া পরমানন্দে পান করেন। একজন ধনাঢ্য ভারতীয় আমাদিগের ভোজনের কায়দাকানুন দেখিবার জন্য ও আমাদিগের ভোজ্যদ্রব্য আস্বাদন করিবার বাঞ্ছা প্রকাশ করিলে অধ্যক্ষ তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করেন। ভোজনকালে যখন পানীয়ের বোতল খোলা হয়, তখন তাহা হইতে ফেনা নির্গত হইতে দেখিয়া তিনি অত্যন্ত অবাক হইয়া যান। অধ্যক্ষ মহাশয় তাঁহাকে তাঁহার বিস্ময়ের কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দেন যে বোতল হইতে ফেনা ছিটকাইয়া পড়িতে দেখিয়া তিনি অবাক হন নাই। তিনি ভাবিয়া কুল-কিনারা পাইতেছেন না যে কিরূপে এই পানীয়কে বোতলের মধ্যে প্রবিষ্ট করানো হইয়াছিল।

অধ্যক্ষ ও কাউন্সিলের সভ্যগণ প্রতিসন্ধ্যায় একত্রে নৈশভোজন করিয়া থাকেন। এই সময়ে তাঁহারা নানা বিষয়ে আলাপচারী হন। কোম্পানীর কাজকর্ম লইয়াও আলোচনা হয়। যাহাতে কুঠিয়ালগণের মধ্যে বিবাদ বা হিংসা না দেখা দেয়, যাহাতে তাঁহারা সৌহার্দ্য-পূর্ণভাবে বাস করিয়া কুঠির কাজকর্ম নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেন সেই পন্থা নির্ধারণের আলোচনা করেন।

ভোজনের পূর্বে ও পরে একজন ভৃত্য একটি রূপার বড় জলপাত্র ও একটি গামলা লইয়া হাজির থাকে। যে কোন দেশেই হস্ত ও মুখ প্রক্ষালন করা উত্তম অভ্যাস। ভারতে গরম ও ধুলার জন্য ইহা একান্ত প্রয়োজনীয়। ভোজনের পাত্রগুলি খাঁটি রূপার তৈরি, ওজনে ভারী ও বৃহদাকার। পানপাত্রগুলিও রৌপ্য নির্মিত। যাহাতে সকল রুচির লোক ভোজনে সমান আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করেন সেইজন্য ইংরাজ, পর্তুগীজ ও ভারতীয় পাচক তাঁহাদিগের স্বকীয় প্রথায় মাংস ও অন্যান্য খাদ্য রন্ধন করেন। পোলাও একটি প্রধান ভারতীয় খাদ্য। ইহা এমনভাবে প্রস্তুত করা হয় যে প্রত্যেকটি চাউল আলাদা আলাদা থাকে। সুগন্ধি মশলা ও সিদ্ধ কুক্কুট ইহাতে ব্যবহৃত হয়। আর একটি প্রিয় খাদ্য হইল ভারতীয় প্রথায় রাঁধা মুরগী। মুরগী ছাড়াইয়া একটি ছোট পাত্রে মাখন দ্বারা ভাজিয়া বাদাম ও কিসমিসের পুর দিয়া ইহা পাক করিতে হয়। কাবাব নামক দেশীয় খাদ্যও ইংরাজগণের বড় প্রিয়। ইহা প্রস্তুত করিতে ছাগ বা গোমাংসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডের প্রয়োজন। এই মাংসখণ্ডগুলিতে নুন ও গোলমরিচ মাখাইয়া রসুন মিশানো তৈলে ডুবাইয়া লইয়া মাংসখণ্ডগুলির মধ্যে সুগন্ধি পাতা ঠাসিয়া একটি শিকে গুঁজিয়া আগুনের উপর ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া ঝলসাইয়া লইতে হয়। বাঁশের কোঁড়, আমের আচার ও সয়াসীমের চাটনী ক্ষুধা-উদ্রেকের জন্য সর্দাসর্বদা মজুত থাকে। সুরাটের বাসিন্দাগণের হিং অত্যন্ত প্রিয় বস্তু এবং পিঠাজাতীয় খাদ্যে ইহার ব্যবহারের বড়ই ধুম। যদিও হিং-এর স্বাদ ও গন্ধ অতীব অপ্রীতিকর তথাপি ইংরাজগণ ইহার খাদ্যগুণের জন্য মাঝে মাঝে ব্যবহার করিতে প্রলুব্ধ হয়েন। সময়ে সময়ে দেশীয় ব্যক্তিগণ এত বেশি হিং ব্যবহার করেন যে তাহার গন্ধে মনে হয় যে সারা সুরাট সহর ভরিয়া উঠিয়াছে।

রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিনে কুঠিতে আরও সমারোহের সহিত ভোজনের আয়োজন হইয়া থাকে। পরবের দিনে হরিণ, ময়ূর, খরগোস ও তিতির ও অন্যান্য প্রকারের মাংস এবং পেস্তা, প্লাম, চেরী ও এ্যাপ্রিকট ইত্যাদি নানাপ্রকার পারস্যদেশ-জাত ফল

থাকে। ইউরোপীয় ও দেশী মদ্য পরিমিতভাবে পান করা হয়। ভোজনের পূর্বে ইংলণ্ডেশ্বরের স্বাস্থ্য ও কোম্পানীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করিয়া মদ্যপান করা হয়। ভোজন শেষ হইলে সকলে মিলিতভাবে কিয়ৎক্ষণ নির্মল আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করেন।

মধ্যে মধ্যে উৎসবের দিনে অধ্যক্ষ কুঠিয়ালগণকে সুরাটের সমীপবর্তী কোন মনোরম উদ্যানে নিমন্ত্রণ করেন। উদ্যানের মধ্যস্থিত জলাশয়ের ধারে বৃক্ষসমূহের সুশীতল ছায়ায় ইঁহারা আনন্দে সারাদিন অতিবাহিত করেন। অধ্যক্ষ ও তদীয় পত্নী পাল্কিতে চড়িয়া তথায় গমন করেন। পাল্কি বহিবার জন্য ছয়জন বাহক প্রস্তুত থাকে এবং এক সময়ে চারজন করিয়া পাল্কি কাঁধে লয়। অধ্যক্ষের কিছু সম্মুখে দুইজন তুড়ুক সওয়ার দুইটি বড় বড় পতাকা লইয়া অগ্রসর হয়। ঘোড়াগুলি পারশ্য বা আরব দেশ হইতে বহুমূল্যে ক্রয় করিয়া আনা হইয়াছে।

এই দুইটি এবং কুঠিয়ালদিগের চড়িবার অন্যান্য অশ্বগুলির জিন ও সাজসজ্জা যেরূপ দামী সেইরূপ জমকালো। গদীগুলি কাজকরা মখমলের, লাগাম ও নোস্তা ও গদীর পশ্চাদভাগ নক্সাকাটা রূপার পাতে মোড়া। দেশীয় ভৃত্যগণের সর্দার ঘোড়ায় চড়িয়া চলে এবং তাহার পশ্চাতে চল্লিশ পঞ্চাশজন ভৃত্য পদব্রজে গমন করে। অধ্যক্ষের পিছনেই কাউন্সিলের সভ্যগণ বড় বড় গাড়িতে চড়িয়া চলেন। গাড়িগুলি খোলা; কেবল যেগুলিতে তাঁহাদের স্ত্রীরা থাকেন সেগুলি ঢাকা। গাড়িগুলির দরজার হাতলগুলি রূপার পাতে মোড়া এবং প্রত্যেকটি একজোড়া সুন্দর বলদে টানিয়া লইয়া চলে। অন্যান্য কুঠিয়ালগণ হয় গাড়িতে নয় ঘোড়ায় চড়িয়া যাত্রা করেন। কোম্পানীর কার্যে অধ্যক্ষ ও কুঠিয়ালগণের ব্যবহারের জন্য কোম্পানী ঘোড়ার ব্যবস্থা রাখেন। কুঠিয়ালগণ অবশ্য হাওয়া খাইবার জন্যও ঘোড়াগুলিকে ব্যবহার করিতে পারেন। অধ্যক্ষ ও কর্মচারীগণ কুঠির বাহিরে গেলে সহরের মধ্য দিয়া এইভাবে জাঁকজমকের সহিত শোভাযাত্রা করিয়া চলেন।

সুরাটে সকাল ও সন্ধ্যায় মৃদুমন্দ বায়ু বহিতে থাকে এবং তখন উত্তাপ প্রশমিত হয়। দিবাভাগে যখন সূর্যের প্রখর কিরণে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় তখন কুঠিয়ালগণ প্রত্যহ এক বোতল করিয়া পানীয় ও ঠাণ্ডা মাংস লইয়া নদী বা জলাশয়ের তীরে বৃক্ষের ছায়ায় প্রত্যহ দুই চারি ঘণ্টা কাটাইয়া আসেন। কাউন্সিলের সভ্য বা ধর্মযাজক কখনই চারি পাঁচ জন সহিস ও তুড়ুক সওয়ার পরিবেষ্টিত গাড়ি ছাড়া কুঠি হইতে বহির্গত হন না। এইভাবে বাহির হইলে দেশীয় লোকজনের তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও সম্ভ্রম জন্মে এবং ইংরাজ দেখিলেই তাঁহাদের সমীহ করিয়া চলে। তাহারা আমাদিগের বন্ধুত্বের মূল্য দেয় এবং আমাদের সহিত পরিচিত হইতে গর্ববোধ করে। ইংরাজদিগের ঠাট ও সততা দেখিয়া দেশীয় লোকেরা তাহাদের নিজেদের সরকার অপেক্ষা ইংরাজদের বড় মনে করিয়া থাকে। ফলে বহু দুস্থ ও নিস্ব দেশীয় ব্যক্তি তাহাদের কষ্ট লাঘবের জন্য নিজেদের সরকারের শরণাপন্ন না হইয়া ইংরাজদের সাহায্য প্রার্থনা করে।

কুঠিয়ালগণ স্বগৃহে বিলাতী কায়দায় ভোজন করেন, কিন্তু কুঠির বাহিরে দেশীয় কায়দা অবলম্বন করেন। দেশীয় ভোজনে খাদ্য ও পানীয় পারশ্য দেশীয় গালিচার উপর ঘরের মধ্যস্থলে রক্ষিত হয় এবং ভোজনকারীরা চতুর্দিকে ঘিরিয়া বসিয়া আহার করেন।

পণ্যদ্রব্য কেনাবেচার সুবিধার জন্য কোম্পানী দালাল নিযুক্ত করেন। এই দালালগণ জাতিতে বেনে, ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের দরদাম ইহাদের নখদর্পণে। ইহারা শতকরা তিন টাকা

দস্তুরীতে কাজ করে। বৎসরে একবার করিয়া ইহাদের বড় পরব দেওয়ালীর দিনে আমাদের নববর্ষের ন্যায় ইহারা অধ্যক্ষ, কাউন্সিলের সভ্য, ধর্মযাজক, চিকিৎসক ও অন্যান্য কুঠিয়াল দিগকে তাঁহাদের পদমর্যাদা অনুযায়ী মণিমাণিক্য, সোনারূপা, রেশমবস্ত্র ইত্যাদি নানাপ্রকার বহুমূল্য জিনিষ ভেট দিয়া থাকে। ইহার ফলে নিম্নপদস্থ কুঠিয়ালগণ তাহাদের মাহিনা, বাস ও গ্রাসাচ্ছাদন ছাড়া সারা বৎসরের পরিধেয় বস্ত্র বিনামূল্যে পাইয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের মাহিনা হইতে কোনকিছু ব্যয় না করিয়াও সুখে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারে। ধর্মযাজক ও চিকিৎসকের অবশ্য আরও উপরি পাওনা রহিয়াছে। বড়দিনের সময়ে অধ্যক্ষ ইঁহাদিগকে বিশেষ পারিতোষিক প্রদান করেন। যখনই কোন ব্যক্তির ইঁহাদের সাহায্যের প্রয়োজন হয় তখনই ইঁহারা সমুচিত পারিশ্রমিক পাইয়া থাকেন।

কুঠিয়ালগণের শারীরিক অসুস্থতা বা ব্যাধি হইলে তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য একজন দেশীয় ও একজন ইংরাজ চিকিৎসক রহিয়াছেন। ইংরাজ চিকিৎসকের বাৎসরিক বেতন ৪০ পাউণ্ড কিন্তু কুঠির বাহিরে পসার হইতে তিনি বিলক্ষণ অর্থ উপায় করেন। রোগের চিকিৎসার জন্য যে যে ঔষধ, গাছগাছড়া, প্রলেপ, মলম ইত্যাদির প্রয়োজন তাহা কোম্পানীর খাতে অবিলম্বে ক্রয় করিবার ঢালা হুকুম আছে। কি সুসময়ে কি দুঃসময়ে কুঠিয়ালগণের যাহাতে কোনোরূপ অভাব বা অসুবিধা না ঘটে কর্তৃপক্ষ সেদিকে সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসের মধ্যে বাস করিয়া যাহাতে কুঠিয়ালগণের আত্মিক বিকৃতি না ঘটে, যাহাতে শারীরিক স্বাস্থ্যের ন্যায় তাহাদের নৈতিক স্বাস্থ্যও অটুট থাকে, তাহার ভার ধর্মযাজকের উপর ন্যস্ত। ধর্মযাজকের বাৎসরিক বেতন ১০০ পাউণ্ড। ইঁহার ভরণপোষণ কোম্পানীর দায়ীত্ব। ইঁহার পরিচর্যার জন্য ভৃত্য রহিয়াছে এবং ইঁহার দরকারানুযায়ী গাড়ি বা ঘোড়া মজুত থাকে। নানা দেশ হইতে আগত ইংরাজ নাবিক ও বণিকগণ ইঁহাকে নানাস্থান হইতে সংগৃহীত দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ্য জিনিষ উপঢৌকন দিয়া তাঁহাদের ভক্তি জ্ঞাপন করেন। তাহা ছাড়া জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহে পৌরোহিত্য করিলে তিনি রীতিমত দক্ষিণা পাইয়া থাকেন। মোটকথা ধর্মযাজককে সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যে রাখিবার জন্য কোনোরূপ কার্পণ্য করা হয়না। পদমর্যাদায় তিনি কুঠির মধ্যে তৃতীয় স্থানীয়। কিন্তু একথা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে তাঁহাকে প্রত্যেক কুঠিয়াল এরূপ সম্ভ্রম ও ভক্তি করিয়া থাকেন যে তিনি এই অঞ্চল বা এমনকি সমগ্র হিন্দুস্থানের সর্বোময় কর্তা হইলেও এত খাতির পাইতেন কি না সন্দেহ।

প্রতি রবিবারে ধর্মযাজককে একবার উপদেশ পাঠ ও তিনবার প্রার্থনা পরিচালনা করিতে হয়। তাহা ছাড়া তিনি একদিন অন্তর কুঠির গীর্জায় সকালে কার্যারম্ভের পূর্বে এবং সন্ধ্যায় দৈনন্দিন কার্যসমাধার পর প্রার্থনা গ্রহণ করেন। তিনি যুবক কুঠিয়ালগণকে প্রশ্নোত্তর দ্বারা নিয়মিত ধর্মোপদেশ দেন। ইনি সুরাটের অধীনস্থ মালাবার উপকূলে কারওয়ার, কালিকট ও রাটেরাস্থিত গীর্জাগুলির নিয়মিত তদারক করিতে যান এবং সেই সকল স্থানের ধর্মযাজকগণকে তাঁহাদের কার্য সম্পর্কে উপদেশ দেন।

ওলন্দাজগণের কুঠিতে ধর্মযাজক নাই। সেইজন্য তাহারা শিশুর জন্মের পর খৃষ্ট-ধর্মসম্মত উপায়ে তাহাদের প্রার্থনাগৃহে স্নান করাইবার জন্য ইংরাজ ধর্মযাজকের সাহায্য যাচিঞা করিয়া থাকে। ওলন্দাজগণের প্রার্থনাগৃহটিকে প্রথম দর্শনে অস্ত্রশালা বলিয়া ভ্রম হওয়া অস্বাভাবিক নহে কারণ তাহাদের গোলাগুলি ও অস্ত্রশস্ত্র সেইস্থানেই মজুত রাখে।

মৃতব্যক্তিগণকে গোর দিবার জন্য সহর হইতে অর্ধ মাইল দূরে একটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে কবরখানা রহিয়াছে। কবরগুলিকে কুঠিয়ালগণ অতীব সুন্দর ও সুশোভিত করিয়া তৈয়ারী করিতে আপ্রান চেষ্টা করেন। এই নয়নাভিরাম কবরগুলিকে বহুদূর হইতে দেখা যায় এবং সুন্দর স্থাপত্যের নিদর্শন হিসাবে এগুলি সুরাট নগরীর সৌন্দর্য বর্ধন করে। ইংরাজদিগের গোরস্থানে যে দুইটি কবর সর্ববৃহৎ ও সুদৃশ্য তাহার মধ্যে একটি জন অক্সটন নামক এক ভদ্রলোকের স্মৃতি বহন করিয়া রহিয়াছে। অন্যটি সুরাটের সুবিখ্যাত ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ মাননীয় অর্জ্জাস্ সাহেবের। ওলন্দাজগণের কবরগুলির মধ্যে প্রধান দুইটির একটি তিন বৎসর পূর্বে মৃত এক প্রধান কর্মচারীর জন্য নির্মিত হইয়াছিল। অপরটি একজন রগুড়ে ওলন্দাজ নৌ-অধ্যক্ষের। ইহার কবরটির ওপর মদ্য মিশ্রিত করিবার তিনটি পাত্র খোদিত আছে বোধ হয় এই কারণে যে মদ্যই ছিল তাঁহার জীবনের প্রিয় সঙ্গী। এই ভূতপূর্ব নাবিকের বন্ধুগণ মাঝে মাঝে যখন তাঁহার কবর দর্শন করিতে যান তখন তাঁহারা খোদিত পানপাত্রগুলি দেখিয়া এতই আমোদ অনুভব করেন যে এমত প্রতীতি হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে তাঁহারা ভুলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহারা মৃতের সম্মুখে গোরস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন।

অনুবাদ : **লালবিহারী গুপ্ত**

আধুনিক সাহিত্য

জীবনের সব স্তরে, সব যুগে সংঘর্ষ ঘটছেই। মানুষকে এই দলাদলি আর বাদ-প্রতিবাদের মধ্য দিয়েই পথ চলতে হয়। আজকের দুনিয়ায় আজ-কাল-পরশুর যে নিকট সংঘাত-সংঘর্ষের ঘনঘটা একালের ব্যক্তিচেতনায় প্রতিফলিত হয়ে সাহিত্যে আধুনিক বক্তব্য, আধুনিক ভঙ্গি, আধুনিক গদ্য-পদ্য হয়ে উঠছে,—বাংলা কবিতার আধুনিক স্তর বলতে সেই বিশ্বব্যাপী বিচ্ছুরণেরই একটা অংশ বুঝতে হবে। দেওয়ালের পোকাটা—অচিরেই মোহিনী আলোর আগুনে যে ছাই হয়ে যাবে,—আর দেওয়ালের টিকটিকি—যে 'ঘৃণ্য ঠাণ্ডা হিংসে',—'বিদ্রূপ-কশা-রসনা গুটিয়ে' যে 'ওৎ-পাতা সংহার' মূর্তিতে প্রতীক্ষা করছে,—প্রেমেন্দ্র মিত্র এই দু'পক্ষের মামলার কথা তুলে বলেছেন—

কে জানে, বুঝি বা পোকা টিকটিকি
দুই নয়।
পর্দাটা ঠেলে উঁকি দেবে কত,
মজে-ই দেখো না অভিনয়!

এবং এ সংঘর্ষ যে কেবলই বাইরের জগতে, তা নয়। জীবনের রহস্য দুর্ভেদ্য। ভাবুকের জল্পনা চলছেই। কে আমি? কী এই জগৎ? মৃত্যুর ওপারে কিছু আছে কি? ইতিহাসের বেড়া ডিঙিয়ে কল্পনা অতীতে-ভবিষ্যতে এগিয়ে যায়। এইভাবে ঘুরতে-ঘুরতে,—সংশয়ে দুলতে-দুলতেই কৈশোর-যৌবন-প্রৌঢ়ত্ব এসে জরায় পৌঁছোয়। প্রেমেন্দ্র মিত্রের সেই আত্মানুসন্ধানের শেষ কয়েক লাইন এই দিক থেকে স্মরণীয়—

তবু হাই ওঠে না'ক। দীর্ঘশ্বাস পড়বেই বা কেন?
সাজানো ছকের ঘুঁটি। ওঠা নামা সমান অলীক
কলেই ঘুরুক সব। পৌঁছোবার ভাবনা যদি ছাড়ো
নিষ্ফল নাগরদোলা দেখবে নিজে ঘুরেই মোহিত।

এ দর্শনে মন ভরবে কী ভরবে না, সে অন্য কথা। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য—তথা আধুনিক কবিতা সম্বন্ধে—এইসব জল্পনা-প্রকাশের মধ্য দিয়েই একটা ধারণা মনে আসে। সমকালীন মানব-সভ্যতার অবস্থা উল্লেখ করে সেই সূত্রে নিজের আদর্শের কথা বলা,—এবং বলবার ভঙ্গিতে বিস্ময়ে হোক্, প্রেমে হোক্,—অন্য কোনো আবেগে হলেও ক্ষতি নেই,—ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার স্বাদ সঞ্চার করা—এই বস্তু আর এই ভঙ্গিরই নাম 'আধুনিক' ভঙ্গি! জানি না, এ মন্তব্যে সংজ্ঞা-প্রণয়নের বৈজ্ঞানিকতা অটুট রইলো কি না; কিন্তু কোনো কবি যদি শুধু এই সাধনাতেই সিদ্ধি লাভ করেন, তাহলেই হোলো। তার বেশি আর কী-ই বা চাই! অবিশ্যি 'দুর্বোধ্য' না হলে 'আধুনিক কবিতা'-ই হোলো না—এরকম মতও মাঝে মাঝে শোনা গেছে। ছাব্বিশ বছর আগে,—১৩৪২-এর "কবিতা" পত্রিকায় এই মন্তব্যটি ছাপা হয়েছিল : 'কাব্যজিজ্ঞাসুদের সমর্থনে এ-কথা অন্তত বলা হোক্ যে সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে পড়ে বুঝতে না পারলেই কবিতা হোলো না—কিম্বা ভালো কবিতা তা-ই, সাধারণ মানুষ সাধারণভাবে পড়েই যা বুঝতে পারে—এমন স্থূল মূঢ়তা

কোনো অধ্যাপকের উচ্চ আসন থেকেও কখনো ধ্বনিত হয়নি।' এ অবিশ্যি অংশ মাত্র। সে-প্রবন্ধে অন্য কথাও ছিল। দুর্বোধ্যতা সম্বন্ধে উদ্ধৃত উক্তিটির কিছু ঝাঁজ কমিয়ে দিয়ে অচিরেই বলা হয়েছিল : 'পাঠকের বোধগম্য হওয়া কবিতার কর্তব্য নয়; কিন্তু এটা দেখা যে যথার্থ কবিতা—যত বিচিত্র রীতি ও প্রকৃতিরই হোক্ না—যথার্থ রসজ্ঞের মর্মস্পর্শ করতে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়নি—অবিশ্যি নিতান্ত ব্যক্তিগত রুচির খাতিরে কিছু গলতি ধরতেই হবে।' কিন্তু তথাকথিত দুর্বোধ্যতাও যে একটা ফ্যাশান, সেটা বুঝতে দেরি হয়নি। সেই "কবিতা" পত্রিকারই দ্বিতীয় সংখ্যায় লেখা হয়েছিলঃ 'আধুনিকতা জিনিসটাই সাময়িক ও আপেক্ষিক : আজকের দুর্জয় একেলিয়ানা মামুলি সাবেকিয়ানায় পরিণত হতে বেশিদিন লাগে না, ভালো চিরদিনই ভালো।...আধুনিকতায় বিশুদ্ধ ও নির্দোষ হয়েও কবিতা যে খারাপ হতে পারে তার প্রমাণ কোনো-কোনো যুবক কবি যথেষ্টই দিয়েছেন।' এ উদ্ধৃতি এখানে প্রয়োগ করা হোলো প্রধানত এই কারণে যে, বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে ১৯৩৫-৩৬ থেকে "কবিতা" পত্রিকাই ভঙ্গিসর্বস্ব 'আধুনিকতা'র মোহ জাগিয়ে তুলেছিল—এই ঐতিহাসিক সত্যের সঙ্গে এ-অংশ একত্র ভেবে দেখা দরকার। সেকালে সেই "কবিতা" পত্রিকাকেও বলতে হয়েছিল : 'আমাদের দেশের বিশেষ এক সুধীশ্রেণীকে সম্প্রতি এই আধুনিকতার মোহে পেয়ে বসেছে। এ নিয়ে দুঃখ করতুম না, যদি জানতুম তাঁদের কারো-কারো মধ্যে কবিত্বশক্তির স্ফুলিঙ্গ আছে। দুর্বলের মুখ-ভ্যাঙচানো হাস্যকর, কিন্তু শক্তির বিকৃতি শোচনীয়। কোনো চলতি ঢঙে কি লোভনীয় কতগুলো মতবাদে অতিরিক্ত আসক্তি কাব্যের স্বাভাবিক প্রেরণাকে বিকৃত করে তুলতে বাধ্য। তার উদাহরণ বর্তমানে বিরল নয় আমাদের দেশে। কোনো মতের মোহে পড়ে সেই মতের সঙ্গে খাপ খাইয়ে রচনা করার মত দুর্গতি কবির পক্ষে আর-কিছুই হতে পারে না।'

তারপর 'আধুনিকতা' সম্বন্ধে আরো অনেক কথা বলা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন। বুদ্ধদেব বসুও বলেছেন। "কবিতা"র দ্বিতীয় সংখ্যার পূর্বোক্ত আলোচনার পরে, দ্বিতীয় বর্ষে—১৩৪৪ সালের আষাঢ় সংখ্যায় সমর সেনের প্রশস্তি ('নবযৌবনের কবিতা') লিখতে বসে বুদ্ধদেব নিজের কথা তুলেছিলেন। তাঁর নিজের নবযৌবনের কাব্য "বন্দীর বন্দনা"র সঙ্গে সমর সেনের "কয়েকটি কবিতা" তুলনা করে তিনি সেখানে আধুনিকতা সম্বন্ধে আর একটি ইশারা লিপিবদ্ধ হতে দিয়েছিলেন : 'তুলনায় এইটেই দেখা গেলো যে "কয়েকটি কবিতা" অনেক বেশি আধুনিক'। "বন্দীর বন্দনা"র বিদ্রোহ সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত, "কয়েকটি কবিতা"র বিদ্রোহের উৎস সামাজিক বিরোধ ও শ্রেণী-সংঘর্ষ।' কিন্তু 'আধুনিকতা' কি তাহলে বিশেষ সমাজের বিশেষ সাময়িক গণ্ডীতেই একান্ত আবদ্ধ হয়ে থাকা? শুধুই পাঁজির হিসেব?

রবীন্দ্রনাথ কি যথেষ্ট আধুনিক হয়েও সত্যিকার চিরন্তন নন? রবীন্দ্রনাথের নানা প্রবন্ধে-নিবন্ধে, নানা চিঠিপত্রে সে-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হতে দেখা গেছে। সমকালীন প্রশংসা বা নিন্দা কোনোটাই চূড়ান্ত নয়। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'কত পূজার নৈবেদ্য মন্দিরের পথ বদলিয়েছে সাহিত্যের ইতিহাসে যখন তার সাক্ষ্য দেখি তখন সমসাময়িক দলিলের উপর আস্থা রাখতে সাহস থাকে না। এমন কি যখন দেখা যায় জীবিতকালে কোনো কবি বা কৃতী সর্বজনীন প্রশংসা পেয়েছে, তার খ্যাতির সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ লাগে। আশঙ্কা হয় যে তাদের লেখা বা কাজ কোনো সাময়িক মৌতাতের যোগান

দিয়েছে—নেশা কেটে গেলে খোঁয়ারির দিনে খ্যাতির বিপদ ঘটবে—নেশার ঝোঁকে পূর্বে যদি ভুল বিচার হয়ে থাকে, অবসাদের দিনে তার উল্টো দিকে আবার বিচারে ভুল হবে।' ১৯৩৩-এর ২৬এ সেপ্টেম্বর এ চিঠি লেখা হয়,—এবং বুদ্ধদেববাবুর "বৈশাখী"তে (১৩৫২) এটি ছাপা হয়। অর্থাৎ সাময়িক মৌতাত সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এ'দের বার বার সতর্ক হতে বলেছিলেন।

তবু সাময়িক বিশেষ বিশেষ মতামত, ভঙ্গি ইত্যাদি পুরোপুরি পরিত্যাগ করে চলাও সম্ভব নয়। এবং অন্য দেশ থেকে কতকগুলি স্থানের নাম, নদীর নাম, মানুষের নাম আমদানি করাটাও দোষের নয়। 'আমদানি' কথাটা কোনোরকম তুচ্ছার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে না। একজন লেখক যখন অ্যাথেন্স, মুনিক, বস্টন, বার্বেডোস দ্বীপ, ত্রিনিদাদ, পানামা ইত্যাদি নানা অঞ্চলে ভ্রমণের সুযোগ পান—এবং এই অর্থে ভ্রমণই যখন তাঁর জীবন হয়ে ওঠে, তখন সেই ভ্রমণের মানচিত্র তো সেই লেখকের রচনায় কিছু পরিমাণে, কিছু-না-কিছু প্রভাব রেখে যাবেই। অর্থাৎ তিনি তাঁর স্বদেশের নিকট-কালের ঘটমান ঘটনাস্রোত ও বস্তুসম্পর্ক দূরে রক্ষা করে,—সমুদ্রে, বন্দরে সুদূরের পিয়াসী হয়ে ঘুরে বেড়াবেন; এবং তারই মধ্যে তাঁর কবিতার চিত্রপটে কখনো বা বস্টনে স্যর বেনেগল রাও-এর 'শুভ্র কেশ, তাপসিক মুখে স্নিগ্ধ হাসি' দেখা যায়,—কখনো ইউ-এন-এর কেরানিত্বে স্বস্তিহারা নরেন্দ্রের হাঁটা-বসা-শোওয়া-স্বপ্ন দেখার কাহিনী প্রবেশ করে—

মান্‌হাটানের পথে জ্বলন্ত রোদ্দুরে
হাঁটি দেখি সারি সারি পণ্য মাংস মদ
স্তূপ করা দৈত্যপুরে—মনে আসে ঘুরে
দূর থেকে কোন্ হাওয়া যেখানে সম্পদ
কেনার জিনিসে নয়;

অমিয়বাবুর "পারাপার", "পালাবদল" থেকে ধরলে তাঁর সদ্যপ্রকাশিত এই কবিতা-সংগ্রহ "ঘরে ফেরার দিন" বেশ খানিকটা সময়ের দূরত্বে ব্যবহিত বলতে হয়। রবীন্দ্র-শতবর্ষ উৎসবের বছরে প্রকাশিত এই "ঘরে ফেরার দিন"-এর প্রথম কবিতাটিই হোলো 'রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে'। রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে সনাতন ব্রহ্মচিন্তা, এবং নিত্যজ্যোতির প্রতি যে প্রণতি উচ্চারিত হয়েছিল, সেই মহিমার কথা স্মরণ করেছেন অমিয়বাবু। সেই স্মৃতিবন্দনার পরে বইয়ের মোট সত্তরের চেয়ে বেশি কবিতা পর পর সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কবিতাগুলি 'অন্তরা' এবং 'অধুনা'—এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করে সাজানো হয়েছে। "পালাবদল"-এর 'সমাবর্ত' কবিতাটিই এক দিক থেকে অমিয় চক্রবর্তীর স্বভাবের স্মারক বলা চলে। বার বার সময়ধারার চিন্তা,—আর, কিছু কিছু রঙ-রূপ-ধ্বনির মধ্য দিয়ে স্থানের ব্যাপ্তি, কালের রহস্য, জীবনের বিস্ময়, স্মৃতিবিস্মৃতির ইঙ্গিত তুলে ধরা—এ-সবই সেই 'সমাবর্ত' লেখাটিতে দেখা গিয়েছিল। আর, শব্দের দিকে আগ্রহ সব গভীর কবিদের মতন তাঁরও আছে। তাঁর 'আগুনি বেগুনি', 'প্রাণনী', 'নির্বিত আকাশ', 'ঝিনুকি সন্ধ্যা', 'স্বর্ণায়না বসুমতী' ইত্যাদি প্রয়োগের অভ্যাস বাংলা কবিতার অনুরাগী পাঠক মাত্রেরই জানা কথা। "ঘরে ফেরার দিন" সে-দিক থেকে নতুন কিছু নয়। তবে 'সার্কাস'-এর মতন কবিতা অমিয়বাবু এর আগে আর কখনো লিখেছেন বলে মনে পড়ে না। এতে ঠিক পুরোপুরি হাসির ঢেউই নয়,—ঈষৎ বিষাদের ভাব যেন মিশে আছে। সার্কাসের রঙ্-মাখা সঙ্ বলেছে :

বত্রিশ বছর নখে শূন্য আঁচড়িয়ে
হে'টেছি চৌতলা উঁচু সরু তার দিয়ে
শুনি ঝোড়ো তালি,
সার্কাস সাবাস ক্লাউন শখের বাঙালি।

এবং এ সার্কাস আমাদের জীবনেই ঘটমান।—

কোথাও পালানো নয়, ভিড়ে-চড়া বাস্
একেবারে সামনে আনে : এ কাজে অবশ্য
পপভ্, ড্যাপলিন, ডিস্নি সবার নমস্য—
ঝলমল প্রাণ থেকে ছলছল বুকে,
আশ্চর্যের নানা ভঙ্গি কত কী কৌতুকে;
তুমি আমি আসবো যাবো, তাঁবুর নিশান
উড়বে আজ আসানসোলে, কাল বর্ধমান।

ছন্দের ঢেউয়ে ঢেউয়ে কখনো উচ্ছলতা, কখনো উদাসীনতা সঞ্চার করবার ক্ষমতা আছে অমিয় চক্রবর্তীর। ১৯৬০-এ স্যান ডিয়েগো-তে লেখা 'নীল চোখ' কবিতাটির কথাই উদাহরণ হিসেবে স্মরণ করা যেতে পারে :

ভাঙলো যখন আকাশভাঙা শেষরাঙানো লহরী,
জানলে কি তা অস্তদিনের প্রহরী।
ভিড়ের মাদল ব্যাঞ্জো বাজা ঘূর্ণিসাজে
স্যান ডিয়েগো
আলোর জেটি স্যান ডিয়েগোর দূর জাহাজে...'

—এ ছবি আর এই গান বাংলা কবিতায় বিদেশের আমদানি বললে একে কোনোমতেই তুচ্ছ করা হয় না। বরং এই কথাই স্বীকার করবার অভিপ্রায় ব্যক্ত হয় যে, বাংলা কবিতায় সংঘাত-সংঘর্ষহীন প্রকৃতি-অনুভবে বা অন্যতর রূপোপলব্ধিতে চিরকালের যে-আগ্রহ অতীতে এ দেশেরই আলোছায়া, নদীগিরি অবলম্বন করে চরিতার্থ হয়েছে, অমিয় চক্রবর্তীর ভ্রমণসুখ সেই ধারাতেই যুক্ত হোলো। আর, মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের "বনবাণী" "বিচিত্রিতা" থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যভঙ্গিতে যেসব লক্ষণ দেখা গিয়েছিল, তারই কোনো কোনো লক্ষণ,—যেমন ছোটো ছোটো লাইন, সহজ মিল—কখনো প্রত্যাশিত শব্দে কখনো বা আকস্মিক কোনো প্রয়োগে! 'সেই আমার, নেই আমার' লাইনটা রবীন্দ্রনাথের কথাই মনে করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সে 'মন্ত্র' কথাটার দিকে তাঁর যে ঝোঁক দেখা গিয়েছিল,—তিনি যে মন্ত্রের ভাষা-ভঙ্গির ভাবনাপথে কবিতার ভঙ্গি সম্বন্ধে ভেবেছিলেন, সে-ঘটনাও মনে পড়লো। পুরোনো দৃশ্যই আমরা বার বার দেখে যাই। অমিয় চক্রবর্তী সেই কথাই বলেছেন তাঁর এ বইয়ের শেষ কবিতা 'একই ছবি'তে। পর্দা ওড়ে তেতলায়,—পুরোনো রাস্তায় পাথর একইভাবে ছড়িয়ে আছে। সকালে একভাবে রোদ পড়ে, বিকেলে আর-একভাবে। তাই দেখে,—নিজের মনের কথা ভেবে,—তিনি লিখেছেন :

বিলম্বিত একই ছবি বাসনা অন্তিম শেষ রোদে
কী মূর্তি ধরেছে ঐ চূড়া-তলে প্রার্থনার বোধে।

এসব ছত্রে রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতির কোনো সমারোহ-ঘোষণাও নেই, কোনো-

রকম কায়দা বা কসরতের প্রদর্শনীও নেই। এ দুর্বোধ্যও নয়, পদ্যপাঠের পদ্যও নয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের এক শ্রেণীর কবিতার প্রৌঢ় রূপানুরাগ সর্বান্তঃকরণে নিজের কবি-চৈতন্যে গ্রহণ করে,—নিজের ধারণায় নিয়ে ভারতবর্ষ থেকে অনেক দূর দূর দেশে অমিয় চক্রবর্তী যে ভ্রমণে নিযুক্ত আছেন, তাঁর সদ্য-প্রকাশিত কবিতাসংগ্রহে সেই পরিচয়ই পুনরায় ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বসন্তে উদাসীন নন—

বসন্ত আজো সেই পুষ্পবেশের
বক্ষ-দোলানি আনে অন্যদেশের,
ইদানীং মার্কিন;
এখানে বরং
শানটুঙ্ টাই পরি
কচি সবুজের রং,
রেশমি আমেজে ধরি
যে-খুশি হয়নি লীন (আভা দেয় দূর চীন)
টলমল নদীজলে, অন্য তারার তলে
আয়ু বায়ু গায়ে দোলে
আলো মার্কিন,
শেষ বেলা কাছে আসা দিন।

এদিকে প্রেমেন্দ্র মিত্রও রূপানুরাগী, কিন্তু তাঁর দৃশ্যক্ষেত্র আমাদেরই 'লুপ লাইনের গ্রামটা'তে—সেই যেখানে—

সবুজ শিরোপা বাঁধা তে-ঢেঙা তালের পাহারায়
শর-ঝোপের ফোয়ারা-তোলা, রাঙা মাটির ঢেউ-এ গড়ানো।

—কিংবা শহর কলকাতার গড়ের মাঠে, মনুমেন্টের পদতল থেকে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সীমানা অবধি ('দিনটা', 'লগ্ন' ইত্যাদি)! তিনি যতো ভ্রমণের সুযোগ পেয়েছেন, অমিয় চক্রবর্তী পেয়েছেন তার চেয়ে অনেক বেশি। ভ্রমণের নানা ছবি—তা দূরেরই হোক আর কাছেরই হোক,—সেইসব ছবির সঙ্গে এ-যুগের ভাবনা জুড়ে দিতে দুজনেই বিশেষ আগ্রহী। যেমন গড়ের মাঠে কে যেন বলেছে 'কটা বাজে',—আর সেই প্রশ্ন শুনে প্রেমেন্দ্র বলেছেন—

আচমকা তার 'কটা বাজে' প্রশ্ন শুনে তবু
ভ্রম হয় যে
এই শহরের প্রাণ-পুরুষই বুঝি—
মহামুক্তি লগ্ন জানতে চায়। [লগ্ন]

শহরের বাঁধানো রাস্তা যতোই ছড়িয়ে যাক্,—জীবনের মসৃণ শৃঙ্খলাবোধ যতোই পরিব্যাপ্ত হোক্,—তবু প্রাণের নিজস্ব তাগিদেই আমরা নদী, ঝড়, পাহাড়ের প্রত্যাশী হয়ে থাকবো।

পাহাড় না হলে
পারবে কী নদী বহাতে!
নদী না বহালে
বন্যা ভাসাবে কি দিয়ে?

এবং পাহাড়ের ভাবনা তিনি এই 'কখনো মেঘ'-এর লেখাগুলিতে বারেবারেই ভেবেছেন। 'কোনো এক দুরারোহ হিম-শৈল-শিখরে' নিঃসঙ্গ শ্যেন-এর ['শ্যেন'] ছবিতেও যেমন, 'সনদ' কবিতাটিতেও তেমনি পাহাড় দেখা দিয়েছে একই ভূমিকায়। তাঁর পাহাড়-প্রীতি যেমন অকৃত্রিম, বারান্দা-চিন্তাও ['বারান্দা'] তেমনি অনিবার্য। এইরকম 'বারান্দা'-ই তাঁর ছোটগল্পেও দেখা গিয়েছিল একদা। বারান্দা আর শূন্যতা তাঁর কাছে পরস্পরের প্রতিশব্দের মতন! আগেকার আমলের নীল শূন্যতা নয়—সুখ-দুঃখ-যন্ত্রণা-উল্লাস দিয়ে 'জীবনের বয়ন-বিলাস',—আর, কালের বল্মীক এসে যেখানে সেই জীবন-নক্সা ফুটো করে দেয়, সেখানকার শূন্যতার কথাই ['আয়নায়'] এ আমলে সর্বাধিক!

আকাশে উড়ে-যাওয়া হাঁসের কলধ্বনি শুনে, কোনো দিন কারও চেতনায় সংসারের চিহ্নিত পথ যে হঠাৎ অন্ধকারে হারিয়ে যেতে পারে,—'বিকল হতেও পারে দিশারী চুম্বক' ['কলধ্বনি'],—অথবা অন্য ভূমিকায়, অন্য পরিবেশে কখনো মনে মনে এ উদ্ভাসনও ঘটা সম্ভব যে—'প্রাণ তো সময়-সত্য, জানে আদি জানে অবসান' ['তির্যক']—এসব ভাবনা প্রেমেন্দ্র মিত্রের পূর্ব-পর্বেও শোনা গেছে,—পুনরায় শোনা গেল। 'মৎস্য, কূর্ম, বরাহ ছাড়িয়ে এসে—নৃসিংহ হয়ে বামনই বংশধর'—মানব-সভ্যতার এ পৌরাণিক দেবচিন্তা একালের আলোয় তিনি নতুনভাবে উদ্ভাসিত হতে দিয়েছেন :

সূর্যের ঢেউ ছলকায় শুধু বহ্নি,
সেই আগুনেও কোথা ছিল এত খাদ!
বিগ্রহ যত ধ্যানের মন্ত্রপূত
বোধন না হতে কেন তার অবসাদ! [কারিগর]

'ছলনা' কবিতাটিতে তাঁর শান্তি-কামনা ফুটেছে। 'অগাণিতিক'-এ তিনি সৃষ্টির কূট অঙ্ক মেলাবার ভাবনা ভেবেছেন। এসবই তাঁর আগের পর্বের পুনঃপ্রকাশ। যেমন অমিয় চক্রবর্তী, তেমনি প্রেমেন্দ্র মিত্র—দুজনেই বাংলা সাহিত্যের আধুনিক প্রিয় কবি,—দুজনেই নিজের নিজের অভ্যস্ত পথে কখনো মেঘ দেখছেন, কখনো বা আলো,—জীবনের লেন-দেন ফুরোবার যে অন্ধকারের কথা জীবনানন্দের একটি প্রসিদ্ধ কবিতায় বেজে উঠেছিল,—সব পাখি নীড়াভিমুখী হবার পরবর্তীকালের সেই অন্ধকারের কথা এঁদের দুজনের লেখাতেই মাঝে মাঝে অনুভব করা যাচ্ছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রশমনসক্ষ ক্ষিপ্রভঙ্গি এবং অমিয় চক্রবর্তীর রূপাবেশ—অধুনা দুই-ই সেই অন্ধকার-সচেতন!*

হরপ্রসাদ মিত্র

---

* ঘরে-ফেরার দিন,—অমিয় চক্রবর্তী। নাভানা। কলিকাতা। মূল্য ৩·৫০ ন.প.।
কখনো মেঘ—প্রেমেন্দ্র মিত্র। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা। মূল্য ৪·০০ টাকা।

সমালোচনা

The Testament of Adolf Hitler: The Hitler-Borman Documents. Cassell. London. 8*s*.

জার্মানির ন্যাৎসী বিপ্লব ও তাহার অধিনায়ক হিট্‌লার সম্পর্কে যুদ্ধোত্তর যুগে বহু মৌলিক উপাদান আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে। উপরোক্ত Hitler-Borman Documents তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বইখানার ভূমিকা লিখিয়াছেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক এইচ, আর, ট্রেভর-রোপার।

যে-সব চিন্তা ও পরিকল্পনা তাহার মনে আলোড়িত হইত হিটলার তাহা তিনবার Table-talk-এর মাধ্যমে ঘনিষ্ঠ সহচর-অনুচরদের কাছে প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রথমবার করিয়াছিলেন ১৯৩২-৩৩ সালে। তখনও ন্যাৎসীদল ক্ষমতায় আসীন হয় নাই, কিন্তু শীঘ্রই হইবে এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। ঐ সময় হিটলার একবারে রাজদণ্ড হস্তগত হইলে কি ভাবে উহা পরিচালিত করিবেন এ সম্পর্কে তাহার মনের ভয়াবহ গোপন পরিকল্পনা অন্তরঙ্গদের কাছে ব্যক্ত করেন। সরকারীভাবে এই কথোপকথন কখনও প্রকাশিত হয় নাই। তবে কয়েক বৎসর পরে (১৯৩৯ সালে) হার্মান রাসনিং নামক হিটলারের একজন ভূতপূর্ব অনুচর *Hitler's Table Talk* নাম দিয়া উহা ছাপাইয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই কথোপকথনের সত্যতা সম্পর্কে তখন অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইংলন্ডের প্রধান মন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেইন বলিয়াছিলেন তিনি এই কথোপকথনের একটি বর্ণও বিশ্বাস করেন না।

এর পরে হিটলার দ্বিতীয়বার তাঁহার মনের অভিপ্রায়-অভিসন্ধির কথা তাঁহার বিশ্বস্ত অনুচরদের কাছে ব্যক্ত করেন ১৯৪২-৪৩ সালে। তখন সমগ্র ইয়ুরোপে হিটলারের জয়-জয়কার। একটি একটি করিয়া ইয়ুরোপ ভূখণ্ডের দেশগুলি দুর্ধর্ষ জার্মান শক্তির কাছে পদানত হইয়াছে। পূর্বপ্রান্তে রুশিয়া তখনও দণ্ডায়মান, কিন্তু জার্মানবাহিনী রুশিয়ার বুকের উপর দিয়া ধাবমান এবং অনতিবিলম্বে রুশিয়াও ভাঙিয়া পড়িবে এ বিষয়ে কাহারও মনে সন্দেহ নাই। ঠিক এই সময় হিটলার তাঁহার বিশ্ববিজয়ের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার কথা অকুণ্ঠিত-চিত্তে অন্তরঙ্গদের কাছে ব্যক্ত করেন, এবং তাঁহার সেক্রেটারী মার্টিন বোরম্যান তাঁহার উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। যুদ্ধের পর বোরম্যানের এই অনুলিপি জার্মানিতে পাওয়া যায়, এবং ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে ইহার ফরাসী ও ইংরাজি অনুবাদ প্রকাশিত হয়।

শেষবার হিটলার তাঁহার চিত্তলোকের দ্বার খুলেন ১৯৪৫ সালের গোড়ার দিকে। ইতিমধ্যে যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়াছে। হিটলারের বিজয়-পতাকা তখন সর্বত্র ধূলি-বিলুণ্ঠিত, এবং তাঁহার সাধের জার্মান রাষ্ট্র মিত্রপক্ষীয় সৈন্যবাহিনীর আক্রমণে ক্ষত-বিক্ষত ও বিধ্বস্ত। যে আশা-ভরসা নিয়া ১৯৩৯ সালে হিটলার যুদ্ধে নামিয়াছিলেন তাহা এখন নির্বাপিত-প্রায়। যুদ্ধে জার্মানির পরাজয়ের অনিবার্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই। এই

ভাগ্য-বিপর্যয়ের সময় তাহার মনে যে-সব কথা তোলপাড় করিতেছিল সে-সব কথা হিটলার তাহার অনুরক্তদের কাছে ব্যক্ত করেন, এবং সেক্রেটারী বোরম্যান পরম নিষ্ঠার সহিত সেগুলি লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন। কেন এমন হইল? কেন এই নিদারুণ ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটিল? কোথায় ভুল হইয়াছে? হিটলারের মনে তখন সর্বক্ষণ এই প্রশ্ন। উত্তরে পৃথিবীর বড় বড় রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রনায়কদের ও ইয়ুরোপের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে হিটলার যে-সব মতামত ব্যক্ত করিয়াছিলেন উপরোক্ত Hitler-Borman Documents-এ তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। হিটলারের জীবনাদর্শ ও আলো-অন্ধকার মিশ্রিত তাঁহার মনের আকৃতি ও বিকৃতি এই Documents গুলিতে রূপায়িত হইয়াছে।

কেন যুদ্ধে জার্মানির পরাজয় ঘটিল এ সম্পর্কে অনেক বিচার-বিশ্লেষণের পর হিট্‌লার যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও সর্বৈব মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। হিট্‌লার বলিয়াছেন ইটালীর সহিত মিতালিই জার্মানির ভাগ্য-বিপর্যয়ের কারণ। হিটলার মুসোলিনীকে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, কিন্তু ইটালীয়ান্ তথা ল্যাটিন জাতিদের প্রতি তাঁহার অশ্রদ্ধার অন্ত ছিল না। ইটালীর সহিত মিতালি রক্ষা করিতে গিয়া তিনি পৃথিবীর সর্বত্র ইয়ুরোপীয় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই এবং তাহার ফলে এসিয়া ও আফ্রিকার অগণিত স্বাধীনতাকামী জনগণের সমর্থনলাভে বঞ্চিত হন। কিন্তু ইহাই শেষ কথা নয়। শেষ কথা হইল ইটালীকে বাঁচাইতে গিয়া তাঁহার রুশিয়া আক্রমণের তারিখ পাঁচ সপ্তাহ পিছাইয়া দিতে হইয়াছিল। হিটলার স্থির করিয়াছিলেন ১৫ই মে জার্মানবাহিনী রুশিয়ার উপর বিপুল বিক্রমে ঝাঁপাইয়া পড়িবে এবং শীতের আগেই রুশিয়া-বিজয় সম্পন্ন করিবে। কিন্তু ইতিমধ্যে মুসোলিনী তাঁহার অজ্ঞাতে গ্রীস আক্রমণ করিয়া এক সঙ্কটাপন্ন অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। হিটলারের সাহায্য ভিন্ন তাঁহার এই সঙ্কট হইতে ত্রাণ পাইবার দ্বিতীয় উপায় ছিল না। হিটলার জার্মান বাহিনী পাঠাইয়া মুসোলিনীকে রক্ষা করিলেন, কিন্তু ইহার ফলে তাঁহার রুশিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান পিছাইয়া দিতে হইল। ১৫ই মে'র পরিবর্তে ২১শে জুন জার্মান বাহিনীর রুশ-অভিযান সুরু হইল। হিটলারের মতে এই পাঁচ সপ্তাহই তাহার সমস্ত পরিকল্পনাকে বানচাল করিয়া দিয়াছে। ১৫ই মে অভিযান সুরু করিতে পারিলে শীতের আগেই জার্মান বাহিনী রাশিয়ার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিতে পারিত এবং সমগ্র রুশিয়া না হউক অন্ততঃ ইয়ুরোপীয় রুশিয়া দখল করিতে পারিত। কিন্তু ২১শে জুন অভিযান সুরু হওয়ায় তাহা হইল না; অভিযান শেষ হওয়ার আগেই রুশিয়ার প্রচণ্ড শীত ও তুষার-বর্ষণে জার্মান বাহিনী একেবারে পঙ্গু হইয়া পড়িল। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে রুশিয়ার শীত ও বরফ রুশিয়াকে নেপোলিয়নের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। ১৯৪১-৪২ খৃষ্টাব্দে আবার সেই শীত ও বরফ রুশিয়াকে বাঁচাইল। এর পর হইতেই যুদ্ধের মোড় ঘুরিতে আরম্ভ করিল।

ইতিহাসের দৃষ্টিতে হিটলারের এই মত কতদূর গ্রাহ্য হইবে সে প্রশ্ন এখানে উত্থাপন করিব না। তবে একটি কথা বলা প্রয়োজন। হিটলারের পরিকল্পনা অনুসারে জার্মান বাহিনী যদি রুশিয়ার মেরুদণ্ড ভাঙিয়া দিতে পারিত, তাহা হইলেই যে জার্মানী এই বিশ্বযুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিত তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায় না। একটি অথবা একাধিক জাতিকে যুদ্ধে পরাজিত করা এক কথা, তাকে দীর্ঘকাল পদানত রাখা অন্য কথা। রুশিয়া জয় করিতে পারিলে হিটলার তথা জার্মানি বহুপ্রকার নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইত, এবং

এই সমস্যাগুলির সমাধান নিশ্চয়ই সহজসাধ্য হইত না। হয়ত এ সমস্যাসমূহের গুরুভারে জার্মানি নিজেই ভাঙিয়া পড়িত।

পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী

The Law. *By* Roger Vailland. Translated from the French by Peter Wiles. Penguin. 4*s*.
The Sovereigns. *By* Roger Vailland. Translated from the French by Peter Wiles. Jonathan Cape. London. 13*s* 6*d*.

সিসিলি থেকে সিরেচ্চিয়ো, নেপল্‌স্ থেকে লিরেচ্চিয়ো—এই দুই হাওয়া এসে খেলে দক্ষিণ ইতালীর পোর্তো মানাকোরের সমুদ্রতীরে। গাছপালা কখনো এদিকে নুয়ে পড়ে, কখনো ওদিকে। পোর্তো মানাকোরে শহরের মাঝখানে চৌমাথায় ভ্রাম্যমান অলস বেকার যুবকেরা তাকিয়ে দেখে, কোন হাওয়া জিত্‌ল। হাওয়া বয়, কিন্তু পরিবর্তনের নয়। রোম সাম্রাজ্যের বিখ্যাত ইউরিয়া শহরের আমল থেকে সিরেচ্চিয়ো ও লিরেচ্চিয়ো বইছে, কখনো একদিকের হাওয়া উত্তাল হয়ে ওঠে, কখনো আরেকদিকের।

বুড়ো বটের মতো এখানকার দুর্ধর্ষ জমিদার। আইনের খাতিরে প্রতাপ কিছুটা খর্ব হলেও নিজের এলাকার মধ্যে এখনো প্রবল। ডন সেজারে ইউরিয়ার ইতিহাসে পণ্ডিত, প্রাচীন শিল্পের সমঝদার সংগ্রাহক। সত্তর বৎসর বয়সেও শিকারে বেরোন, এবং আত্মীয়-পরিবার ও প্রজাদাসদাসীর কোনো কুমারী মেয়ের বিবাহ হতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত বিপত্নীক ও নিঃসন্তান ডন সেজারের সঙ্গে তারা রাত্রিযাপন না করে।

পোর্তো মানাকোরের সবচেয়ে জনপ্রিয় খেলা—The Law। তাসে যার ভাগ্য খোলে সে হয় খেলায় দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। তার অধিকার খেলার অন্যান্য যোগদানকারীদের মধ্যে একজনকে অযাচে চূড়ান্তভাবে অপমান করার। যাকে অপমান করা হয় তার প্রতিবাদের কোনো উপায় নেই। তাকে চুপ করে বসে থাকতে হয় তাসের মুখ চেয়ে। যখন তার ভাগ্য খুলবে তখন অপমানের অধিকার হবে তার। এই অধিকার যে পায় সে তার নির্বাচিত লোককে যত কৌশলে অপমানে জব্দ করতে পারে তত তার বাহাদুরী। চারিদিকে লোক রুদ্ধশ্বাসে লক্ষ্য করে এই মান-অপমানের খেলা।

এই খেলাই পোর্তো মানাকোরের জীবনের পরিবর্তনহীন প্রতীক।

উপন্যাসের শেষে দেখা যায় গুণ্ডাদলের সর্দার ধরা পড়তে পড়তেও পুলিশের সাহায্যে বেঁচে গিয়ে নির্দোষীকে জেলে পাঠায়। মেরুদণ্ডহীন দোদুল্যমানচিত্ত বিচারকের সুন্দরী স্ত্রী সর্দারের ছেলের সঙ্গে পালাতে গিয়ে পারে না, পুলিশের কর্তার লালসার কাছে ধরা দেয়। বুড়ো ডন সেজারে উপদংশজাত পক্ষাঘাতে মরে জবরদস্ত কুমারী দাসী-কন্যার বক্ষে হাত রেখে। অর্থাৎ পোর্তো মানাকোরের ব্যর্থতার বেড়াজাল থেকে বেরোতে কেউ পারে না। শাসনব্যবস্থা, বেশভূষা আচারবিচারের যতই পরিবর্তন হোক, প্রাচীন ইউরিয়ার আমল থেকে যেন মানুষের মনের কোনো মৌলিক পরিবর্তন নেই।

চরিত্রচিত্রণে, বৈপরীত্যের সমাবেশে, বর্ণনার সজীবতায় পোর্তো মানাকোরের জীবন

পাঠকের সামনে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। লেখক শুধু দুই হাওয়ার খেলা দেখিয়েই সন্তুষ্ট, কোনো দলের প্রতি স্পষ্ট সহানুভূতির পরিচয় নেই। যা আছে তা হচ্ছে রিয়্যালিটির প্রতি সম্ভ্রম—তা সে রিয়্যালিটি যতই ক্ষয়িষ্ণু হোক না কেন। দক্ষিণ ইতালীয় সমাজের অচলায়তন অতি যত্নে রূপায়িত করা হয়েছে। এই রূপায়নই যেন উপন্যাসের সম্পূর্ণ উদ্দেশ্য। তা সত্ত্বেও লেখকদের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ ধরা পড়ে। অব্যক্ত হলেও এই ব্যঙ্গ অতি তীক্ষ্ণ। কিন্তু এই উপন্যাসের প্রধান উৎকর্ষ একটি সমাজকে সংহত ও জীবিতভাবে চিত্রায়ণের মধ্যে। অনুবাদের মধ্য দিয়েও ভাষার অনুত্তেজিত স্থিরতা ও বর্ণনার সুষ্ঠুতা আনন্দ দেয়। অতি কুশলী, সুপাঠ্য ও উপভোগ্য উপন্যাস সন্দেহ নেই।

একই লেখকের পর পর লেখা দুই উপন্যাস এত ব্যবধান সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। *The Sovereigns*-এ আঙ্গিকের কৌশল প্রচুর, ভাষা ও ঘটনাপ্রবাহ কৌতুকপ্রদ, কিন্তু সারবস্তু কিছুই নেই। বক্তব্যহীন, নিরুৎসাহ এক লেখক স্ত্রীর অনুমত্যানুসারে পরকীয়া-সংসর্গের দ্বারা কীভাবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে লেখার প্রেরণা ফিরে পেলেন তারই কাহিনী *The Sovereigns*। উপন্যাসের নামকরণ ঐ লেখকের দর্শন অনুযায়ী। প্রতি মানুষের ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং স্বাধীন, সমস্ত সামাজিক নীতিবোধের ঊর্ধ্বে, অতএব Sovereign।

*The Law*তে যে সমাজচেতনা ছিল এখানে তা লুপ্ত হয়ে হঠাৎ ব্যক্তিনির্ভর হয়ে পড়েছে। পরকীয়াসংগমের পরেও লেখককে প্রেরণাহীন বলেই আমাদের মনে হয়, কারণ লেখকের পুনরুজ্জীবিত লেখনী প্রথম যে কয়েকটি লাইন লেখে তা এই উপন্যাসেরই প্রথম অনুচ্ছেদ! প্রেরণাহীন লেখক নিজের নিরুৎসাহকে উপজীব্য করে ক্লান্ত লেখনী চালালেন—ফল এই উপন্যাস। *The Law* পড়ে যতখানি উৎসাহিত হতে হয় ততখানি হতাশ করে *The Sovereigns*। প্রথম উপন্যাসে জীবনের প্রতি যে অনুসন্ধিৎসা ছিল তা এখানে নির্জীব আত্মরতিতে পরিণত হয়েছে।

চিদানন্দ দাশগুপ্ত

People and Life. *By* Ilya Ehrenburg. MaCgibon & Kee. London. 25*s*.

১৮৯১ সালে যে-ব্যক্তির জন্ম, এবং তারপর যার সত্তর বছর এই পৃথিবীতে অতিবাহিত হয়েছে, তিনি অবশ্যই পেছন ফিরে তাকাতে পারেন। ইলিয়া এহ্‌রেনবুর্গের সাম্প্রতিক গ্রন্থ এই বক্তব্যেরই স্বাক্ষর। যদিও কিয়েভ প্রদেশে তাঁর জন্ম, কিন্তু জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বছরগুলি কেটেছে বাইরে। তিনি অনেক ঘটনার সংগে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত। দুটি বিশ্বযুদ্ধ, রাশিয়ার বিপ্লব—এই সমস্ত কিছুই তাঁর চোখের ওপর দিয়ে ঘটে গেছে। জীবনের প্রায় সায়াহ্নে উপস্থিত এহ্‌রেনবুর্গ তাই হাসি কান্নায় উচ্ছল দিনগুলির দিকে ফিরে তাকিয়েছেন। তাঁর মনে অনন্ত সংশয়। বারে বারে সন্দেহ তাঁর মনকে আঘাত করেছে। স্বভাবতই তিনি দ্বিধা বোধ করেছেন, যদি সকলের চিত্র যথাযথ উপস্থিত না করতে পারেন!

গ্রন্থের প্রারম্ভেই তিনি বলেছেন—

I have long wanted to write about some people I have met during my life, some of the events I have participated in or seen ; but more than once I have put off the task : either circumstances were against it or I was overcome by doubts wheather I could re-create the image of a man, a picture faded with years, wheather I could rely on my memory.

কিন্তু তাঁর মনে সঞ্চিত সেই সব বিচিত্র রঙীন স্মৃতি কোথাও আবদ্ধ হয়ে যায়নি। বরঞ্চ সময়ের ব্যবধান তার রঙ অনেক বেশী সুন্দর, অনেক বেশী উজ্জ্বল করে তুলেছে। অতীত ও বর্তমানের এই দুস্তর ব্যবধানের ওপর এহ্‌রেনবুর্গের সোৎসাহ আবেগ সেতুবন্ধ করেছে।

১৯০৬ সাল। এহ্‌রেনবুর্গের বয়স তখন মাত্র পনের। বৈপ্লবিক কাজে যুক্ত থাকার জন্য তিনি গ্রেপ্তার হন। কিছুকাল কারাজীবন যাপনের পর তিনি বাধ্য হন নির্বাসন গ্রহণ করতে। নির্বাসিত জীবন যাপনের জন্য প্যারিসে এলেন। এবং অচিরেই এখানকার শিল্পী ও লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে নিজের একটি স্থান করে নিলেন। তাঁর প্যারিসের জীবন অনন্ত বিস্ময়ের সঞ্চার করে। এখানকার অভিজ্ঞতা তাঁর অপরিমেয়। এখানে তিনি সব কিছুরই সম্মুখীন হয়েছেন। উপবাস। নিরন্তর উদ্বেগ। আর তার সংগে যুক্ত হয়েছে মদ্যপান, প্রেম এবং বিরহের ইতিহাস। তাঁর জীবনে প্যারিসের স্মৃতি এক স্থায়ী চিত্র। তাঁর লেখায় প্যারিস সর্বত্র সোচ্চার।

বস্তুত এই জীবনের অপূর্ব অনুভূতির ইতিহাসই গ্রন্থের অধিকাংশ স্থান অধিকার করেছে। তাঁর প্যারিসে অবস্থান কাল : ১৯০৬-১৯১৭ সাল। রুশ বিপ্লবের আগে পেট্রোগ্রাডে ফিরে যাবার আগে পর্যন্ত তিনি প্যারিসে ছিলেন। এখানকার স্মৃতি আলো অন্ধকারের মত সাধারণ ও সুন্দর।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লেনিনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎকার এখানেই ঘটে। অথচ এই সাক্ষাৎকারের বিবরণ এহ্‌রেনবুর্গ অত্যন্ত সংক্ষেপে দিয়েছেন। অনন্য নিপুণতার সঙ্গে লেনিনের জীবনের অন্য একটি দিক তিনি পাঠক সাধারণের কাছে তুলে ধরেছেন।

প্যারিসকে এহ্‌রেনবুর্গ ভিন্ন চোখে দেখেছেন। তাঁর কাছে প্যারিসের জীবন অন্য এক সুরে বাঁধা। এর অন্য এক দিক আছে। যা উজ্জ্বল নিওন আলোয় পরিমিত ধনীর বিলাসকেন্দ্র নয়। তাঁর কাছে প্যারিসের আবেদন স্বতন্ত্র। যার কাফেখানায় দরিদ্র শিল্পী এবং লেখকের দিনের পর দিন কেটেছে। যেখানে সাধারণ মানুষ রাত দশটার সময় ঘুমতে যায় এবং ভোরবেলা ঘুম থেকে ওঠে। আত্মীয়, পরিজনে ঘেরা সংসারের ছোট পরিধিতে এখানকার মানুষের মনের শিকড় বিস্তৃত।

এই প্যারিস শহরকেই এহ্‌রেনবুর্গ ভালবেসেছেন। সেখানকার দরিদ্র, ভবঘুরে শিল্পী-লেখকের সান্নিধ্যের উত্তাপ একটু একটু করে গ্রহণ করেছেন। তাঁর পরিমণ্ডল গড়ে উঠেছিল এপোলিনেয়ার, ম্যাক্স জ্যাকব, রিভিয়ারা, মদিলিয়ানি, পিকাসো, জাডকাইন প্রমুখকে নিয়ে। এ নামের তালিকা দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর করা যায়। সেই অন্তরঙ্গ বৃত্তের আরো যারা বিশিষ্ট কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন, তাঁদের অনেকের নাম আমাদের কাছে অপরিচিত।

মদিলিয়ানির ওপর সম্পূর্ণ একটি পরিচ্ছদ তিনি রচনা করেছেন। এই চরিত্র চিত্রণে আমরা লেখকের অনবদ্য সংবেদনশীলতার পরিচয় পাই। মদিলিয়ানির চিত্র, তাঁর জীবন,

তাঁর প্রেম—সব কিছু অসাধারণ অন্তরঙ্গ আবেগে এক সহৃদয় সুহৃদের হৃদয় দিয়ে তিনি লিখেছেন। আমরাও লেখকের সঙ্গে সহসা ফুসফুসের রোগে আক্রান্ত মদিলিয়ানির অকাল মৃত্যুতে যন্ত্রণা বোধ করি। আর সেই সঙ্গে প্রশ্ন আসে মনে। জেনে-র কি আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় ছিল না। এক মৃত্যু কেন আর এক অকাল মৃত্যুর অপার যন্ত্রণা সৃষ্টি করল!

এমন অনেকে আছেন, যারা চিত্রকলা সম্পর্কে রুশীয় মতামতের ওপর তির্যক দৃষ্টিপাত করেন। কেবলমাত্র এ-দেশের শিল্প রসিকের রসবেত্তা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেই তাঁরা ক্ষান্ত হন না। এমন মন্তব্যও প্রকাশ করেন যে, বস্তু-সাদৃশ্য চিত্র ছাড়া সেখানে অন্য ছবি সমাদৃত নয়। মদিলিয়ানির চিত্র সম্পর্কে এহ্‌রেনবুর্গ তাঁর নিজের বক্তব্য উপস্থিত করে অনেক সন্দেহের নিরসন করেছেন। এহ্‌রেনবুর্গ লিখেছেন—

He sometimes painted nudes, but most of his works were portraits. He created a multitudes of people: their sadness their frozen immobility, their hunted tenderness, their air of doom move the gallery visitors.

It may be that some zealots of realism will say that Modigliani played tricks with nature, that the women he painted have too elongated neck and arms. As if a painting were an anatomical drawing! Do not thoughts emotions passions alter the proportions? Modigliani was not a remote observer: he did not contemplate people from a distance, but lived with them. These are the portraits who loved longed and suffered; . . .

পিকাশো সম্পর্কেও ইতস্তত অনেক কথা লেখক বলেছেন। সকলেই কৌতুকবোধ করবেন রাশিয়ান মেয়েটির সঙ্গে এহ্‌রেনবুর্গের কথোপকথনের বিবরণ পাঠ করে। মেয়েটি বলেছিলেন পিকাশো অঙ্কিত এহ্‌রেনবুর্গের ছবির দিকে তাকিয়ে। 'আমার পিকাশোর ছবি অর্থহীন মনে হয়। তিনি আপনার বন্ধু, তাই আপনি তাঁর ছবির ভক্ত।' অবশ্যই এহ্‌রেনবুর্গ এ প্রগলভ উক্তিতে বিস্মিত হননি। এমনকি ক্ষুব্ধও না। লক্ষ্য করার বিষয় পিকাশো কম্যুনিস্ট হওয়া সত্ত্বেও তিনি কোথাও তাঁর সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক বাক্-বিস্তারের চেষ্টা করেননি। আর কে না জানেন মদিলিয়ানির রাজনৈতিক অনীহার কথা! তিনি তাঁর ভাইকেও বোকা ভাবতেন। কারণ মদি-র ভাই ছিল সমাজবাদী। হাঁ, বন্ধুমহলে মদিলিয়ানি মদি নামেই পরিচিত।

অতীতকে এহ্‌রেনবুর্গ শ্রদ্ধার সঙ্গে, আবেগের সঙ্গে স্মরণ করেছেন। সেই পুরনো দিনকে কোথাও লুকোবার চেষ্টা তিনি করেননি। প্যারিসের জীবন তাঁর কোনোমতেই রাজনৈতিক কাজে আবদ্ধ ছিল না। অথচ তা' নিয়ে কোথাও তিনি লজ্জা প্রকাশ করেননি। প্রত্যেক মানুষই তার অতিক্রান্ত যৌবনের দিকে ফিরে তাকায়। সে জীবনের ঝড়, এলোমেলো বাতাসের শিহরণের স্মৃতি তাকে অতীত কাতর করে তোলে। এহ্‌রেনবুর্গের ক্ষেত্রেও এই কথা সত্য। প্যারিসের অতি পরিমিত রাজনৈতিক জীবনের জন্য তিনি দুঃখবোধ করেননি। তাঁর দুঃখের কারণ আজকের প্যারিস। যার ছবি এখন একেবারেই বদলে গিয়েছে। প্যারিসকে তিনি এত ভালবাসতেন বলেই এত সহানুভূতি, এত স্বচ্ছন্দ আবেগের সঙ্গে

তাঁর নিজের জীবনকে প্যারিসের সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে দেখতে পেরেছেন।

য়ুলি মার্‌টভ সম্পর্কেও এহ্‌রেনবুর্গের বক্তব্য উল্লেখ্য। লেনিনের অন্যতম প্রধান বিরোধী, মেনশেভিক মারটভ সম্পর্কে লেখকের উক্তি প্রনিধানযোগ্য।

. . . . . I sometimes met Yuly Martov, the wellknown Menshevik, a gentle and attractive man of the utmost integrity . . . . He was wretchedly unhappy over the collapse of the Second International; he coughed, went about in a threadbare overcoat, shivered with cold and like Lipinski—tried to convince me—though in reality he was convincing himself.

আজ আর সন্দেহ থাকা উচিত নয় যে, সোভিয়েট রাষ্ট্রে কঠোর নিয়মের রাজত্বের অবসান ঘটেছে। তার স্থলাভিষিক্ত হয়েছে পরমতসহিষ্ণুতা এবং মানবতাবোধ। সেখানে এখন নতুন বাতাস সঞ্চারিত।

পুরনো নিয়মের বেড়া এখন একেবারে ভেঙ্গে গেছে। সেই বেড়া ভাঙ্গার ঝড় লেখকের অন্যতম উপন্যাস *The Thaw*-এর সূচনা করে। এই আবহাওয়ার পরিপূরক আর একটি উপন্যাস *The Spring*। আর এহ্‌রেনবুর্গের সাম্প্রতিক আত্মকথা *People and Life* নূতন সুরে বাঁধা, এক নূতন জীবনবোধের দৃষ্টান্ত।

এহ্‌রেনবুর্গ এই বক্তব্যের সঙ্গতি রক্ষা করেছেন। চেকভের বড় গল্প The Duel-এর অংশ বিশেষ তাই তাঁর মনকে এত বেশী বিচলিত করেছে।

'In search of truth men make two steps forward and one step back but the desire for truth and stubborn will drive them forwards and who knows? Perhaps their boat will sail to the real truth:'

চেকভের সঙ্গে তিনি তাঁর কণ্ঠ মিলিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে বলেছেন—

To-day far continents have become a suburb. Even the moon has somehow come nearer. But for all that the past has not lost its power, and if within a life time a man changes his skin an infinite number of times—almost as often as his suits—still he does not change his heart; he has but one.

নৃপেন্দ্র সান্যাল

স্তেফান জেব্রাইগের গল্প-সংগ্রহ—১ম ও ২য় খণ্ড। অনুবাদ : দীপক চৌধুরী। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। মূল্য প্রতি খণ্ড পাঁচ টাকা।

মোনালিসা—আলেকজাণ্ডার লারনেট হলেনিয়া। অনুবাদ : বাণী রায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। মূল্য ২·৫০ টাকা।

অনুবাদ যে-কোনো সাহিত্যেরই শ্রীবৃদ্ধি ঘটায়। বাংলাদেশে কৃত্তিবাস-পরাগল খানের সময় থেকে শুরু ক'রে আজ পর্যন্ত সার্থক অনুবাদের সংখ্যা কম নয়। গত পাঁচশ বছরে বাংলা

সাহিত্যের যে আশ্চর্য উন্নতি ঘটেছে তাতে অনুবাদ ও ভাবানুবাদের অবদানও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

এই পটভূমিতে যখন আধুনিক কালের প্রথিতযশা সাহিত্যিককে অনুবাদকর্মে আত্মনিয়োগ করতে দেখি, তখন খুবই আশান্বিত হ'য়ে উঠি। বাংলা সাহিত্যের অনুবাদ বিভাগটি একেবারে দীন না হলেও যশস্বী সাহিত্যিকেরা এদিকে কমই আকৃষ্ট হন। কবিতায় তবু প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে এবং বুদ্ধদেব বসুর মতো কৃতী কবিদের অনুবাদের কাজে আত্মনিয়োগ করতে দেখা যায়। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে কিন্তু হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত এবং (অনুবাদে না হোক সম্পাদনার কাজে) বুদ্ধদেব বসুর নাম নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হয়। বাকী যাঁরা আছেন, তাঁরা প্রধানতই অনুবাদ-সাহিত্যিক। এঁরাও আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। কিন্তু প্রধানত যাঁরা কথাসাহিত্যিক তাঁরা এ পথে আসেননি বলেই যে এই সব অনুবাদকদের কাজে নামতে হ'য়েছে সে অসহায়তার কথাও ভুলে গেলে চলবে না।

কাজেই দীপক চৌধুরী এবং বাণী রায়ের মতো কথাসাহিত্যিককে অনুবাদ-শিল্পে হাত লাগাতে দেখে আনন্দিত বোধ করেছি। এইভাবে অন্যান্য লেখক-লেখিকা এদিকে এগিয়ে এলে আমাদের উপকারই হবে। কারণ অনুবাদ কেবল ভাবের দিগন্তকেই প্রসারিত করে না। রচনাশৈলী এবং শব্দসম্ভারকেও পরিপুষ্ট করে। সার্থক অনুবাদক মাত্রেই জানেন, উন্নত ধরনের কোনো সাহিত্যকর্মের অনুবাদকালে রচনারীতি, বাচনভঙ্গী ও শব্দপ্রয়োগের যে একাগ্র অনুশীলন ঘটে তাতে কেবল উপস্থিত অনুবাদটিই সার্থক হ'য়ে ওঠে এমন নয়, অনুবাদকের স্বকীয় রচনাও ভবিষ্যতে লাভবান হ'য়ে উঠতে পারে। তার কারণ, রসোত্তীর্ণ অনুবাদ কেবল ভাষান্তর নয়, মূল রচনার সঙ্গে অনুবাদকের ঐক্যানুভূতির দ্বিতীয় সৃষ্টি। অনুবাদকের অভিজ্ঞতা-ভাণ্ডারও যে এই প্রক্রিয়ায় ঐশ্বর্য-মণ্ডিত হবে এ তো বলাই বাহুল্য।

স্তেফান জেব্রায়াইগ বর্তমান শতাব্দীর একজন স্বনামধন্য লেখক। সাহিত্যের প্রায় সমস্ত বিভাগে, এমন কি অনুবাদেও, তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত। বাংলাতে তাঁর কয়েকটি উপন্যাস এর আগে অনূদিত হ'য়েছে। সেদিক থেকে তিনি বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিচিত নন। দীপক চৌধুরীর অনুবাদের ফলে সে পরিচয়ের দিগন্ত আরো অনেক দূর প্রসারিত হল। দুটি খণ্ডে মোট বারোটি গল্প অনূদিত হয়েছে। প্রত্যেকটি গল্পই স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল এবং অনুবাদ সাবলীল।

দুঃখের সঙ্গে বলতে হয়, বাণী রায়ের অনুবাদ কিন্তু তেমনভাবে আকৃষ্ট করতে পারে নি। একে তো মূল বইটিই কিছুটা অকিঞ্চিৎকর, তার উপর অনুবাদিকা ভাষার উপর অযথা জুলুম ক'রে তাকে প্রায় ভীতিপ্রদ ক'রে তুলেছেন। এই আধা ঐতিহাসিক আধা কাল্পনিক রচনায় তিনি এতো বেশী তৎসম শব্দ এবং বিদেশী বাক্যাংশের আক্ষরিক অনুবাদের সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন যে রীতিমতো শিরদাঁড়া খাড়া করে পড়তে হয়। ফলে জ্ঞান হয়তো আমাদের কিছুটা বাড়ে, কিন্তু শিল্পানুভূতির যে-সূক্ষ্ম আনন্দের জন্যে আমরা গল্পসাহিত্যের দ্বারস্থ হই তার কোনো ঠিকানা পাওয়া যায় না। তুলনায়, ভূমিকাটি বরং অনেক সুলিখিত।

মণীন্দ্র রায়

ক্যাক্‌টাস্‌— বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা ৭। মূল্য ৩·০০ টাকা।

কলেজ স্ট্রীট থেকে কালীঘাট : বাসে চড়ে এই পথ অতিক্রম করা প্রাণান্তকর প্রয়াস। সেদিন শ্রীযুক্ত বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় "ক্যাক্‌টাস্‌" বইটি ছিল আমার পথের সঙ্গী। বইটি পড়তে পড়তে মুহূর্তের মধ্যে চলে এলাম, মনেই হলো না যন্ত্রণাদায়ক বাসযাত্রার কথা। "ক্যাক্‌টাস্‌"-এর প্রধান গুণ সুখপাঠ্যতা। বস্তুতঃ লঘু প্রবন্ধের আকর্ষণ এইখানে যে, তা সাধারণ গল্প-উপন্যাসের চেয়েও সুখপাঠ্য।

ক্যাক্‌টাস্‌ নামে যে আপাত বৈষম্য—রুক্ষতা ও কোমলতা, মননশীলতা ও সহৃদয়তা, বৈদগ্ধ ও পরিহাসরসিকতা, তার সুন্দর সমন্বয় হয়েছে এই গ্রন্থে।

লঘু প্রবন্ধ যে বিষয়ীর ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, তা "ক্যাক্‌টাস্‌" পড়া মাত্রই অনুভব করা যায়। বিষয়বৈচিত্র্য এই গ্রন্থের প্রধান আকর্ষণ নয়, লেখক-ব্যক্তিত্বের আকর্ষণই বড়ো কথা। 'বিবাহ', 'খাওয়া ও খাওয়ানো', 'গণিতের দুঃখ', 'জ্যোতিষ ও জ্যোতিষী', 'হারাধন', 'পেরেক', 'শ্বশ্রূ-চরিত-কথা' প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনায় মজলিশী প্রজ্ঞাবান লেখককে চিনে নিতে পারি।

মুখবন্ধে লেখক বলেছেন, এই বই লঘু প্রবন্ধের পঞ্চম সংকলন। জানিয়েছেন, তাঁর বয়স পঞ্চাশ হয়েছে। লেখক-জীবনে পঞ্চত্ব-প্রাপ্তি নয়, পঞ্চমত্ব-প্রাপ্তি। একটি আশ্চর্য সত্য কথা বলেছেন, 'এ ধরনের বই আমার লাস্ট সিন। অরিজিন্যাল সিন্‌ হ'ল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীর ঘরে জন্মানো, সে ঘরে ভূমিষ্ঠ হলেই আপনি কলম ছোটে, মুখে খই ফোটে। তাই মুখবন্ধ।'

বাঙালি মধ্যবিত্ত সাহিত্যসাধনার পটভূমির যে আশ্চর্য-সত্য পরিচয় লেখক দিয়েছেন, তা আমাদের সকলেরই মনের কথা। মৌলিক ভাবনা, সমাজচিন্তা, এবং সেই চিন্তাভাবনা প্রকাশের রসোত্তীর্ণ ফল "ক্যাক্‌টাস্‌"।

বাঙালি বাচাল, এই অপবাদ সুপ্রচলিত। লঘুপ্রবন্ধে সেই অপবাদ অধুনা প্রায়শই সত্য বলে প্রমাণিত হচ্ছে। তার কারণ অধিকাংশ লঘু প্রবন্ধকার কেবল লঘুতারই অধিকারী, তার উৎস প্রজ্ঞার অধিকারী নন। মানবস্বভাব ও মানবজগৎ সম্পর্কে তাঁদের কোনো বক্তব্য নেই। সেগুলি অর্থহীন প্রলাপোক্তি। অধুনা তারই নাম রম্যরচনা। সুখের কথা, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সস্মিত প্রজ্ঞার অধিকারী। তিনি ভিজে বাঙালিপনার, ন্যাকামির লৌকিক সংস্কারের ও অযৌক্তিক সমাজবিন্যাসের সমালোচক। কিন্তু বন্ধুরূপে আলাপচারণায় উৎসাহী, বাঙালিস্বভাব ও মানবস্বভাবের প্রতি বিমুখ নন, এবং তির্যক ব্যঙ্গে শ্লেষে হাসিতে, কখনো গুরুকথার মিশেল দিয়ে, কখনো বা নির্মম সত্য উচ্চারণ করে তাঁর মানবপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। "ক্যাক্‌টাস্‌"-এর আয়নায় বাঙালি পাঠক আত্মদর্শন করতে পারেন। আশা করব, এই বই তাঁর লাস্ট সিন্‌ হবে না, আরো দৃশ্যপট তিনি দেখাবেন।

অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়